হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org
email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: রমজান ১৪৪৪ হিজরী

নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني

মূল লেখক- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আনসারী

দাওরাতুল হাদীস, জামেয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ

আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও পরিচয়:

নাম: মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, পিতার নাম: আলহাজ্ব নূহ। দাদার নাম: নাজাতী। ডাক নাম: আবু আব্দুর রহমান। ইউরোপের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ায় তার জন্ম হওয়ায় তাকে আলবানী বলা হয়। তিনি ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আলবেনিয়ার রাজধানী স্কোডার (বর্তমান নাম তিরানা) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তার পরিবার ছিল দরিদ্র। কিন্তু দীনদারী ও জ্ঞানার্জন তাদের দরিদ্রতার উপর ছিল বিজয়ী। তার পিতা ছিলেন আলবেনিয়ার একজন বিজ্ঞ আলেম। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ তার কাছে ছুটে যেত। তিনি সাধ্যানুযায়ী মানুষকে দীনের জ্ঞান দিতেন এবং তাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে শরীআ বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।

আলবেনিয়ায় প্রেসিডেন্ট আহমদ জাগু পাশ্চাত্য সেকুলার সভ্যতার দিকে ধাবিত হয়ে নারীদের পর্দা নিষিদ্ধ করলে তিনি শিশু আলবানীকে নিয়ে সপরিবারে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে হিজরত করেন।

শিক্ষা জীবন:

দামেস্ক আসার পর আলবানীর বয়স প্রায় নয় বছর হলে তার পিতা তাকে সেখানকার 'স্কুল অব এইড চ্যারিটি' নামক একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানেই তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

প্রচলিত একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দীন সম্পর্কে ভালো জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা ছিল না। বিধায় তার পিতা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ ছেলের পড়া-শোনার ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করতেন। এ কারণে, তিনি নিজে সন্তানের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করে তার মাধ্যমে তাকে আল কুরআনুল কারীম, তাজবীদ, নাহু, সরফ এবং হানাফী ফিকাহ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন। ফিকাহের মধ্যে হানাফী ফিকাহের অন্যতম কিতাব মুখতাসরুল কুদুরী পড়ান। তিনি তার পিতার কাছেই হাফস বিন আসেম এর রেয়াওয়াত অনুযায়ী কুরআনের হিফয সমাপ্ত করেন।

শায়খ আলবানীর শিক্ষকগণ:

ইমাম আলবানীর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল হাতেগণা কয়েকজন। তন্মধ্যে:

১) তার পিতা শায়খ আলহাজ্ব নূহ।

২) তার পিতার বন্ধু বিশিষ্ট আলেম শাইখ সাঈদ আল বুরহানীর নিকট কিশোর আলবানী হানাফী ফিকাহের কিতাব মুরাকিল ফালাহ, নাহুর কিতাব শুযূরুয যাহাব এবং আধুনিক যুগের লিখা আরবী সাহিত্য ও ইলমুল বালাগাহর কিছু কিতাব পড়েন।

৩) এর পাশাপাশি তিনি তখনকার দামেস্কের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মুহাম্মদ বাহজা আল বাইতারের বিভিন্ন দারসে অংশ গ্রহণ করতেন।

৪) আলবানী রহ. এর আরেকজন শায়খ হলেন আল্লামা রাবিগ আত ত্বব্বাখ। তিনি সিরিয়ার অত্যন্ত বড়মাপের একজন আলেম ছিলেন। তিনি পরিচিত ছিলেন হালাবের আল্লামা হিসেবে। এই শায়খের নিকট তিনি হাদীস পড়েন। অতঃপর তিনি আলবানী রহ. কে হাদীসের ইজাযা প্রদান করেন।

কর্ম জীবনঃ

তিনি তার পিতার কাছেই ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখেন এবং এক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঘড়ি মেরামতকেই জীবীকার পেশা হিসেবে বেছে নেন। এই পেশায় তিনি ব্যক্তিগত পড়া-লেখা ও বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়নের পর্যাপ্ত সময় পান। এভাবে সিরিয়ায় হিজরতের মাধ্যমে তার জন্যে আরবী ভাষা ও মূল উৎস থেকে শরীআতের জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়।

হাদীস অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ

যদিও তার পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল তার ছেলে যেন হানাফী মাযহাবের তাকলীদ করে। যার কারণে তিনি তাঁকে ইলমে হাদীস চর্চায় মনোনিবেশ করতে সতর্ক করতেন। তথাপি আলবানী ইলমুল হাদীস ও হাদীস চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এক্ষেত্রে তাঁকে প্রেরণা যোগায় শাইখ মুহাম্মদ রশীদ রেজা কর্তৃক প্রকাশিত আল মানার নামক একটি মাসিক ম্যাগাজিন। সেখানে হাদীস বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সন্দর্ভ প্রকাশিত হয় এবং তিনি সেগুলো নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এভাবে ধীরে ধীরে হাদীস চর্চায় মনোনিবেশ করার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। তারপর ব্যাপক আগ্রহ সহকারে হাদীস চর্চা শুরু করেন। ফলে মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন।

এবার তিনি হাদীসের সেবাযয় কলম ধরলেন। সর্ব প্রথম যে কাজটি করলেন তা হল, তিনি হাফেয ইরাকী রহ. এর লিখা “ المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما

في الإحياء من الأخبار "নামক কিতাবটি কপি করে তাতে টিকা সংযোজন করলেন।

শাইখের এই কাজটি তার সামনে হাদীস নিয়ে গবেষণার বিশাল দরজা খুলে দেয়। এরপর ইলমে হাদীস নিয়ে গবেষণা করা তার প্রধান কাজে পরিণত হয়। ক্রমেই তিনি দামেস্কের ইলমী জগতে এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করেন।

যার পরিপ্রেক্ষিতে দামেস্কের জাহেরিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তার জন্য বিশেষ একটি কক্ষ নির্ধারণ করে দেয়, যেন তিনি সেখানে অবস্থান করে গবেষণা কর্ম চালাতে পারেন। সেই সাথে লাইব্রেরীর একটি চাবিও তাকে দেয়া হয় যেন তিনি যখন খুশি তাতে প্রবেশ করতে পারেন।

তবে বই-পুস্তক লেখা শুরু করেন তার জীবনের দ্বিতীয় স্তরে। এই পর্যায়ে এসে তিনি সর্বপ্রথম যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা হল: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد এটি একটি দলীল নির্ভর তুলনামূলক আলোচনা ভিত্তিক ফিকাহের কিতাব। এটি একাধিক বার মুদ্রিত হয়েছে।

ইলমে হাদীসের রীতি অনুসারে হাদীসের তাখরীজ সংক্রান্ত প্রথম পর্যায়ের অন্যতম একটি গ্রন্থ হল:

"الروض النضير في ترتيب و تخريج معجم الطبراني الصغير

যা এখানো পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সাথে যুক্ত থাকার কারণে শাইখ আলবানীর মধ্যে সালাফী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। সেই সাথে সালাফী ধারার বিশ্ব বরেণ্য আলেম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ. রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার ফলে এই রীতির উপর তার দৃঢ়তা আরও মজবুত হয়।

শাইখ আলবানী এবার সিরিয়ায় তাওহীদ ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াতের পতাকা তুলে ধরলেন। ফলে সিরিয়ার অনেক আলেম ওলামা তার সাক্ষাতে আসেন এবং শাইখ ও ঐ সকল আলেমদের মাঝে তাওহীদের বিভিন্ন মাসআলা, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ, মাযহাবী গোঁড়ামি, বিদআত ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়।

ফলে মাযহাবের অন্ধভক্ত গোঁড়া আলেম-ওলামা, সুফী, বিদআতী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন একশ্রেণির নামধারী আলেমদের পক্ষ থেকে তিনি প্রচণ্ড

বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এ সকল ব্যক্তিরা সাধারণ অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। তাকে 'পথভ্রষ্ট ওহাবী' বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে এবং জনসাধারণকে শাইখ থেকে সর্তক করতে থাকে।

অপরপক্ষে তার দাওয়াতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন দামেস্কের ইলম ও পরহেজগারীতায় প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য আলেম-ওলামাগণ। তারা শাইখকে তার দাওয়াতের পথে দৃঢ় কদমে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেন। সে সকল ওলামাগণের মধ্যে অন্যতম হলেন: বিশিষ্ট আলেমে দীন আল্লামা বাহজাত আল বাইতার, সিরিয়া মুসলিম যুব সংঘের প্রধান শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আল ইমাম, শাইখ তাওফীক আল বাযারাহ প্রমুখ।

শাইখ আলবানীর দাওয়াহ কার্যক্রম:

তিনি প্রতি সপ্তাহে দুদিন আকীদা, ফিকাহ, উসূল এবং ইলমুল হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে দারস প্রদান করতেন। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও উপস্থিত হতেন। এতে তিনি যে সকল বইয়ের উপর দারস প্রদান করতেন সেগুলো হল:

১) ফাতহুল মাজীদ, লেখক: আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব।

فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

২) আর রওজাতুন নাদিয়াহ শারহুদ দুরারুল বাহিয়্যাহ লিশ শাওকানী শারহু সিদ্দীক হাসান খাঁন।

الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني شرح صديق حسن خان.

৩) উসূলুল ফিকাহ, লেখক: আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ।

أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف

৪) আল বায়িসুল হাসীস শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস লি ইবনে কাসীর, লেখক: আল্লামা আহমদ শাকের।

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير شرح احمد شاكر

৫) মিনহাজুল ইসলাম ফিল হুকম, লেখক: মুহাম্মদ আসাদ।

منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد

৬) ফিকহুস সুন্নাহ, লেখক: সাইয়েদ সাবিক।

فقه السنه لسيد سابق

খ) প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে তিনি দাওয়াতী সফরে বের হতেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি মাসে এক সপ্তাহ দাওয়াতী কাজ করতেন। পরবর্তীতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন জেলায় দাওয়াত নিয়ে যেতেন। পাশাপাশি জর্ডানের বিভিন্ন এলাকায়ও সফর করতেন এবং অবশেষে তিনি জর্ডানের রাজধানী আম্মানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই কারণে তার কিছু দুশমন সিরিয় সরকারের কাছে তার ব্যাপারে চুগলখোরি করলে সরকার তাকে জেলে পাঠায়।

কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও হিজরত:

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শাইখ সিরিয়া ক্ষমতাসীনদের নজরদারীতে পড়েন যদিও তিনি রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। যা তার সামনে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তিনি দুবার গ্রেফতার হয়েছেন। প্রথমবার ৬৮ সালের আগে দামেস্কের কেল্লা কারাগারে বন্দি ছিলেন একমাসের জন্য। এটা সেই কারাগার যেখানে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ৬৮ সালের যুদ্ধের সময় সিরিয় সরকার সকল রাজবন্দীকে মুক্ত করে দিলে তিনিও মুক্ত হন।

কিন্তু যুদ্ধ আরও কঠিন রূপ ধারণ করলে শাইখকে পুনরায় কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এবার কেল্লা কারাগারে নয় বরং দামেস্কের পূর্ব-উত্তরাঞ্চলের আল হাসাকা কারাগারে। শাইখ এখানে আট মাস অতিবাহিত করেন। কারাগারে অবস্থানের এই আট মাস সময়ে তিনি হাফেয মুনযেরীর লেখা মুখতাসার সহীহ মুসলিম তাহকীক করেন এবং সেখানে অন্যান্য বড় বড় রাজবন্দী ব্যক্তিত্বের সাথে মিলিত হন।

পরবর্তীতে তিনি সিরিয়া ছেড়ে জর্ডানে পাড়ি জমান এবং রাজধানী আম্মানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

কার্যক্রম ও অবদান:

শাইখের অনেক ইলমী অবদান ও খেদমত রয়েছে। তন্মধ্যে:

১) শাইখ দামেস্ক একাডেমীর কতিপয় শিক্ষকদের সাথে আল্লামা বাহজাত আল বাইতারের বিভিন্ন দারসে অংশ গ্রহণ করতেন। সে সকল শিক্ষকদের একজন হলেন ইযযুদ্দীন আত তানূহী রহ.।

২) দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআ ফ্যাকাল্টির পক্ষ থেকে তাকে ইসলামী ফিকাহ কোষ এর বুয়ূ বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হাদীসগুলো তাখরীজ করার জন্য মনোনীত করা হয় যা ১৯৫৫ইং সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩) মিসর ও সিরিয়া একীভূত হওয়ার যুগে হাদীসের কিতাবসমূহ তাহকীক ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। শাইখকে এই প্রকল্প তত্ত্বাবধান কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

৪) ভারতের ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া বেনারসে হাদীসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য তার নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু তৎকালীন সময় ভারত-পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ চলছিল। তাই স্ত্রী-পরিবার নিয়ে যাওয়া কঠিন হওয়ায় তিনি সেখানে যেতে অপারগতা পেশ করেন।

৫) সৌদি আরবের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শাইখ হাসান আলুশ শাইখ আব্দুল্লাহ ১৩৮৮ হিজরীতে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার ডিপ্লোমা ইন ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন করেন কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

৬) ১৩৯৫ হিজরী থেকে ১৩৯৮ হিজরী পর্যন্ত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্য হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয়।

৭) স্পেনের মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এর আহবানে তিনি সেখানে গিয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন যা পরবর্তীতে 'আকীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রেই হাদীস স্বয়ং সম্পন্ন প্রমাণ' এই শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৮) কাতার সফরে গিয়ে সেখানে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল: "ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা।"

৯) সৌদি আরবের মহামান্য গ্র্যান্ড মুফতী শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. এর পক্ষ থেকে তিনি মিসর ও মরক্কো এর ফতোয়া ও গবেষণা বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। অনুরূপভাবে ব্রিটেনের তাওহীদ ও কুরআন-সুন্নাহর দিকে আহবানের জন্য গঠিত একটি ইসলামী সংগঠনের প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

১০) তাঁকে দেশে-বিদেশে অনেক সম্মেলনে অতিথি হিসেবে আহবান করা হয়। কিন্তু তিনি তার জ্ঞান-গবেষণার কাজে ব্যস্ততার দরুন অনেক দাওয়াতে সাড়া দিতে পারেননি।

১১) তিনি কুয়েত ও আরব আমিরাতে সভা-সেমিনারে অনেক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ইউরোপের কয়েকটি দেশে গমন করে সেখানকার মুসলিম অভিবাসী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অনেক মূল্যবান দারস পেশ করেন। এছাড়াও তিনি ব্রিটেন এবং জার্মানিতে দাওয়াতী উদ্দেশ্যে সফর করেন।

১২) শাইখের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করে অগণিত ছাত্র বের হয়েছে যারা পরবর্তীতে বড় বড় গবেষক হিসেবে ইসলামে সেবায় আত্ম নিয়োগ করে করেছেন।

ইমাম আলবানীর কতিপয় ছাত্রঃ

শাইখ আলবানী বিভিন্ন দেশ প্রচুর সফর করতেন। যার কারণে তার ছাত্রের সংখ্যাও প্রচুর যারা তার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কতিপয় ছাত্র হল,

১) আলামা ইহসান ইলাহী যহীর

২) ডক্টর বাসিম ফায়সাল আল জাওয়াবিরাহ

৩) শায়খ হুসাইন বিন আউদাহ আল উয়াইশাহ

৪) আল্লামা শায়খ রবী বিন হাদী আল মাদখালী

৫) শায়খ আলী হাসান আল হালাবী

৬) শায়খ মুকবিল বিন হাদী আল ওয়াদিঈ

৭) শায়খ মাশহুর হাসান আলে সালমান

৮) শায়খ জামীল যাইনূ

এছাড়াও অসংখ্য বড় বড় আলেম রয়েছেন যারা শাইখ আলবানী রাহ. এর সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেছেন।

তাঁর লিখিত কিতাবাদি ও গবেষণাঃ

শাইখের অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক ও গবেষণা কর্ম রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে অনেকগুলোই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কোন কোনটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। সেগুলো থেকে নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বইয়ের তালিকা প্রদান করা হলঃ

১) ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল। (নয় খণ্ডে সমাপ্ত)

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

২) সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ। (সহীহ হাদীস সিরিজ এবং সেগুলোর কিছু ব্যাখ্যা ও শিক্ষা।) (সাত খণ্ডে সমাপ্ত)

وسلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدها

৩) সিলসিলাতুল আহাদীসিয যাঈফাহ ওয়া মাযূআহ (দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সিরিজ এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তার কুপ্রভাব)। (চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত)

سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيئ في الأمة

৪) সহীহ ওয়া যাঈফ সুনান আবূ দাউদ (সুনান আবুদাউদের হাদীসগুলো তাখরীজ এবং তাহকীক করে সহীহ ও যঈফ দুভাবে ভাগ করা হয়েছে।) (দশ খণ্ডে সমাপ্ত)

صحيح وضعيف سنن أبي داود

৫) সহীহ ও যঈফ সুনান নাসাঈ (সুনান নাসাঈর হাদীসগুলো তাহকীক করে সহীহ ও যঈফ দুভাবে ভাগ করা হয়েছে।) (সাত খণ্ডে সমাপ্ত)

صحيح وضعيف سنن النسائي

৬) সহীহ ওয়া যাঈফ সুনান তিরমিযী (সুনান তিরমিযীর হাদীসগুলো তাহকীক করে সহীহ ও যঈফ দুভাবে ভাগ করা হয়েছে।)(সাত খণ্ডে সমাপ্ত)

صحيح وضعيف سنناالترمذي

৭) সহীহ ওয়া যাঈফ সুনান ইবনে মাজাহ (সুনান ইবনে মাজার হাদীসগুলো তাহকীক করে সহীহ ও যঈফ দুভাবে ভাগ করা হয়েছে।) (ছয় খণ্ডে সমাপ্ত)

صحيح وضعيف سننابن ماجه

৮) সহীহ ওয়া যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব। (তারগীব ওয়াৎ তারহীব কিতাবের হাদীসগুলো তাহকীক করে সহীহ ও যঈফ দুভাবে ভাগ করা হয়েছে।) (পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত)

صحيح وضعيف الترغيب والترهيب

৯) তাববীব ওয়া তারতীবু আহাদীসিল জামে আসসাগীর।

تبويب وترتيب أحاديث الجامع الصغير وزياداته على أبواب الفقه

১০) সহীহ ওয়া যাঈফুল জামে আস সগীর ওয়া যিয়াদাতিহী।

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته

১১) আত তা’লীকাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনে হিব্বান।

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

১২) সহীহুল আদাবুল মুফরাদ। (এই গ্রন্থে ইমাম বুখারী রহ. রচিত আল আদাবুল মুফরাদ কিতাবের সহীহ হাদীসগুলো তাহকীক করে পৃথক করা হয়েছে।)

صحيح الأدب المفرد

১৩) যঈফুল আদাবুল মুফরাদ। (এই গ্রন্থে ইমাম বুখারী রহ. রচিত আল আদাবুল মুফরাদ কিতাবের দুর্বল হাদীসগুলো তাহকীক করে পৃথক করা হয়েছে।)

ضعيف الأدب المفرد

১৪) তামামুল মিন্নাহ ফীৎ তা’লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ। (আল্লামা সাইয়েদ সাবিকের লেখা ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থের তাহকীক ও তাতে টিকা সংযোজন।)

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

১৫) তাহকীক মিশকাতিল মাসাবীহ লিত তিবরীযী। (মিশকাতুল মাসাবীহের তাহকীক)

تحقيق كتاب مشكاة المصباح للتبريزي

১৬) আস সুমুরুল মুসতাত্বাব ফী ফিকহিস সুন্নাহ ওয়া কিতাব।

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

১৭) আত তাওহীদ আওয়ালান ইয়া দুআতাল ইসলাম। (হে ইসলাম প্রচারকগণ,সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিন)

التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام

১৮) ফাযলুস সালাতি ‘আলান্নাবী। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠের ফযীলত)

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

১৯) ফিতনাতুত তাকফীর। (মুসলমানকে কাফির বলার ফিতনা)

فتنة التكفير

২০) তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদ। (কবরকে মসজিদ বানানোর ব্যাপারে সতর্কতা)

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

২১) শারহুল আকীদা আত ত্বহাবীয়্যাহ। (আকীদা ত্বহাবিয়ার ব্যাখ্যা)

شرح العقيدة الطحاوية

২২) তাহকীক মুখতাসারুর উলূ’ লিল আলিয়্যিল গাফফার (ইমাম যাহাবীর লেখামুখতাসার আল উলূ কিতাবের তাহকীক)

تحقيق مختصر العلو للعلي الغفار لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

২৩) কিতাবুল ঈমান (ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রচিত কিতাবুল ঈমানের তাহকীক ও তাখরীজ)

تحقيق و تخريج كتاب الإيمان لابن تيمية

২৪) জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ (মুসলিম নারীর পর্দা)

جلباب المرأة المسلمة

২৫) হিজাবুল মারআহ ও লিবাসুহা ফিস সালাত (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. রচিত সালাতে নারীর পর্দা ও পোশাক শীর্ষক কিতাবের তাহকীক ও তাতে টিকা সংযোজন)

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية

২৬) আর রাদ্দুল মুফহিম (যারা নারীদেরমুখ ও হস্তদ্বয় ঢাকাকে ওয়াজিব বলে তাদের প্রতিবাদ)

الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقتنع بقولهم: إنه سنة ومستحب

২৭) তাহরীমু আলাতিত ত্বরব। (বাদ্য যন্ত্র হারাম)

تحريم آلات الطرب

২৮) ওসীলা গ্রহণ: প্রকার ও বিধিবিধান

التوسل أنواعه وأحكامه

২৯) আহকামুল জানাইয (জানাযার বিধান ও বিদআত সমূহ)

أحكام الجنائز وبدعها

৩০) যিলালুল জান্নাহ ফী তাখরীজিস সুন্নাহ

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم

৩১) আদাবুয যুফাফ (সুন্নাহর আলোকে বাসর শয্যার আদব)

آداب الزفاف في السنة المطهرة

৩২) মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ (হজ্জ ও উমরার বিধিবিধান)

مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع

৩৩) কিয়ামু রামাযান (রামাযান মাসে তারাবীহর সালাতের ফযীলত, নিয়ম-কানুন, জামায়াতে আদায়ের বৈধতা এবং ইতেকাফ সংক্রান্ত আলোচনা)

قيام رمضان

৩৪) সালাতুত তারাবীহ (তারাবীহর সালাত)

صلاة التراويح

৩৫) সহীহু সীরাতিন নববিয়্যাহ (বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের জীবনী)

صحيح السيرة النبوية

৩৬) সালাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা (ঈদগাহে ঈদের নামায পড়া সুন্নত)

صلاة العيدين في المصلى هي السنة

৩৭) তাহকীক ফিকহিস সীরাহ (মুহাম্মদ গাযালী রচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থের তাহকীক)

تحقيق فقه السيرة لمحمد الغزالي

৩৮) ইমাম নাসাঈ রচিত কিতাবুল ইলম গ্রন্থের তাহকীক, তাখরীজ ও তাতে টীকা সংযোজন)

تحقيق و تخريج كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي

৩৯) হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী রহ. রচিত কালিমাতুল ইখলাস কিতাবের তাহকীক, তাখরীজ ও তাতে টীকা সংযোজন)

كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلي

৪০) মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ। (ইমাম তিরমিযী রচিত শামাইলে মুহাম্মাদিয়া বা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বভাব-চরিত্র ও দেহাবয়ব বিষয়ক কিতাবের তাহকীক ও সংক্ষিপ্ত করণ)

مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن

৪১) সালাতুর রাগাইব তথা রজব মাসের বিদআত সালাতুর রাগাইব প্রসঙ্গে দু মহামান্য ইমাম আল ইয ইবনু আব্দিস সালাম ও ইবনুস ছলাহ এর মাঝে সংঘটিত মুনাযারা)

مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام و ابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة

৪৩) নাসবুল মাজানীক (গারানিকের ঘটনা প্রসঙ্গে বিভ্রান্তির জবাব)

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق

৪৪) কিসসাতুল মাসীহিদ দাজ্জাল ও নুযুলি ঈসা আলাইহিস সালাম (দাজ্জাদ ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ প্রসঙ্গ)

قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة و السلام وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة رضي الله عنه مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم

৪৫) ফিকহুল ওয়াকি (দাওয়াহর ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির জ্ঞান থাকা প্রসঙ্গে একটি গবেষণা মূলক বই)

حول فقه الواقع

৪৬) সিফাতুল ফাতওয়া (ইমাম আহমাদ বিন হামদান রচিত ফতোয়া, মুফতী এবং ফতোয়া প্রার্থীর বিবরণ শীর্ষক কিতাবের তাহকীক)

تحقيق صفة الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي

৪৭) হুকুকুন নিসা (মুহাম্মদ রশীদ রেযা কর্তৃক রচিত ইসলামে নারী অধিকার শীর্ষক কিতাবের তাহকীক ও তাতে টিকা সংযোজন)

حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي لمحمد رشيد رضا

৪৮) হুকমু তারিকিস সালাত (সালাত পরিত্যাগ কারীর বিধান)।

حكم تارك الصلاة

৪৯) সিফাতুস সালাত (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত - তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত যেন আপনি তাঁকে দেখছেন)।

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها

৫০) তারাজুতুশ শাইখ আল আলবানী (আল্লামা আলবানী রহ. যে সকল হাদীসের উপর সহীহ কিংবা যঈফ হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে মত পরিবর্তন করেছেন)

تراجعات الشيخ الألباني في بعض أحكامه الحديثية

এছাড়াও আল্লামা আলবানী রহ. এর লিখিত হাদীসের খেদমতে এবং ইসলামে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। লেখার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হল না।

আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফায়সাল পুরস্কারঃ

ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও ইসলামী শিক্ষার প্রচারে অবদানের জন্য তাকে ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ ইং সনে আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফায়সাল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তার পুরস্কারের শিরোনাম ছিল: "প্রায় একশ'র অধিক পুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে হাদীসের তাহকীক, তাখরীজ ও গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসের সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সিরিয় নাগরিক সম্মানিত শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানীকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হল।"

তাঁর ব্যাপারে আলেমগণের ভূয়সী প্রশংসাঃ

১) শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম রহ. বলেনঃ

"তিনি ছিলেন সুন্নতের অনুসারী, হকের সাহায্যকারী এবং বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী।"

২) শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. বলেনঃ

"বর্তমান বিশ্বে আসমানের নিচে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত এত বড় হাদীসের আলেম আমি দেখিনি।"

শাইখ বিন বায রহ. এর নিকট এই হাদীসটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **"আল্লাহ তায়ালা প্রতি একশ বছরের মাথায় এই উম্মতের জন্য এমন একজনকে পাঠাবেন যিনি দীন-ইসলামকে সংস্কার করবেন।"** তিনি বলেন: আমার ধারণা, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী হলেন এ যুগের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। আল্লাহ সব চেয়ে ভাল জানেন।

৩) আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন রহ. বলেনঃ

"শাইখের সাথে বৈঠকাদীতে বসার পর (যদিও তা কম) যা বুঝতে পেরেছি তা হল: তিনি সুন্নাহর প্রতি আমল এবং আমল-আকীদা উভয় ক্ষেত্রেই বিদআত উৎখাতে খুবই আগ্রহী। আর তার লিখিত বই-পুস্তক পড়ে তার ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, তিনি হাদীসের সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। এ সকল বই-পুস্তক দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অনেক মানুষকে উপকৃত করেছেন-যেভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তারা লাভবান হয়েছে তদ্রূপ নীতি নির্ধারণ এবং ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তারা লাভবান হয়েছেন। এটি মুসলমানদের জন্য বড় একটি বড় প্রাপ্তি। আল

হামদুলিল্লাহ। আর ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে তার জ্ঞানগর্ভ গবেষণা সত্যি চমৎকৃত হওয়ার মত।"

৪) খ্যাতনামা মুফাসসির আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ আল আমীন আশ শানকীতী:

শাইখ আব্দুল আজীজ আল হাদ্দাহ বলেন: আল্লামা শানকীতী শাইখ আলবানীকে বিস্ময়করভাবে সম্মান করতেন। তিনি মদীনার মসজিদে হারামে দারস প্রদান করার সময় যদি শাইখ আলবানীকে হেঁটে যেতে দেখতে তিনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সালাম প্রদান করতেন।

৫) শাইখ মুকবিল আল ওয়াদিঈ:

"আমি যে আকীদা পোষণ করি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে দীন হিসেবে মনে করি তা হল, শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী হলেন সে সকল মুজাদ্দিদগণের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি প্রযোজ্য: "আল্লাহ তায়ালা প্রতি একশ বছরের মাথায় এই উম্মতের জন্য এমন একজনকে পাঠাবেন যিনি দীন-ইসলামকে সংস্কার করবেন।"

শাইখের স্ত্রী-পরিবার:

ইমাম আলবানী রহ. মোট চার জন বিবাহ করেছিলেন। এদের মধ্যে ৩ স্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে ১২ জন সন্তান দান করেছিলেন। বয়স অনুপাতে তাদের নাম:

১ম স্ত্রী থেকে:

১) আব্দুর রহমান

২) আব্দুল লতীফ

৩) আব্দুর রাযযাক

দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে:

৪) আব্দুল মুসাব্বির

৫) আব্দুল আ''লা

৬) মুহাম্মদ

৭) আব্দুল মুহাইমিন

৮) আনীসা

৯) আসিয়া

৯) সুলামা

১০) হাসসানাহ

১১) সাকীনাহ

তৃতীয় স্ত্রী থেকে-

১২) হেবাতুল্লাহ

চতুর্থ স্ত্রী থেকে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. এর অন্তিম ওসিয়তঃ

প্রথমতঃ আমি আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও যারা আমাকে ভালবাসে তাদের নিকট এই ওসিয়ত করছি, যখন তাদের কাছে আমার মৃত্যু সংবাদ পৌছবে তারা যেন আমার জন্য আল্লাহর নিকট রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে দুয়া করে এবং আমার মৃত্যুতে কেউ যেন নিয়াহা বা উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন না করে।

দ্বিতীয়তঃ যেন অনতি বিলম্বে আমাকে দাফন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় কাফন-দাফনের প্রস্তুতির জন্য যাদেরকে না হলেই নয় তাদেরকে ছাড়া নিকটাত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবকে মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে যেন দাফন কর্ম বিলম্ব না করে। আমাকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব পালন করবে আবু আব্দুল্লাহ ইজ্জত খাযার এবং তিনি যাকে এ কাজে সহযোগিতার জন্য পছন্দ করবেন। তিনি আমার প্রতিবেশী এবং একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তৃতীয়ঃ তিনি মৃত্যুর আগেই তার বাড়ির অদূরেই কবরের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দেন। যেন গাড়িতে উঠিয়ে তার লাশ বহন করে দূরে নিতে না হয় কিংবা কবর দিতে আসা লোকজনকে গাড়িতে চড়ে লাশের সাথে যেতে না হয়। সেই সাথে এমন পুরনো গোরস্থানে যেন তাকে কবর দেয়া হয় যেটার ব্যাপারে আশা করা যায় যে, সেটা আর খুঁড়া-খুঁড়ি করা হবে না।

আমি যদি দেশের বাইরে মারা যাই তবে আমার দাফন কর্ম সমাধান করার আগে যেন দেশে আমার সন্তান সন্তান-সন্ততি বা অন্য লোকজনকে খবর না দেয়া হয়। অন্যথায় তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে হয়ত এমন কিছু করবে যার কারণে আমার দাফন কর্ম বিলম্ব হয়ে যাবে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, আমি যেন তার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করি যে, তিনিমৃত্যুর আগেই আমার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

চতুর্থঃ আর আমার লাইব্রেরীর ব্যাপারে ওসিওয়ত হল, লাইব্রেরীর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, পাণ্ডুলিপি, আমার লেখা বা অন্যের লেখা সকল বই-পুস্তক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াকফ করছি। যেন কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে-সালেহীনের মানহাজের দিকে দাওয়াতের পথে এগুলো স্মৃতি হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। কারণ, আমি এককালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। আল্লাহর নিকট আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকা অবস্থায় তিনি যেভাবে আমার মাধ্যমে ছাত্রদের উপকার করেছেন ঠিক সেই ভাবে আমার লাইব্রেরীতে যে সকল মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য আসবে তারাও যেন এগুলো থেকে উপকৃত হয়। আর আমি নিজেও যেন তাদের দুয়ার মাধ্যমে লাভবান হই।

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحاً ترضاه و أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك و إني من المسلمين.

"হে প্রভু, তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দিয়েছ তার শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান কর। আরও তাওফীক দান কর এমন নেক আমল করার যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমার উপকারের জন্যে আমার সন্তান-সন্ততিকে পরিশুদ্ধ করে দাও। আমি তোমার নিকট তওবা করলাম। নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

২৭ জুমাদাল আওয়াল ১৪১০ হিজরী।

আখিরাতের পথে যাত্রাঃ

আল্লামা আলবানী রহ. এই নশ্বর জগত ছেড়ে আখিরাতের পথে যাত্রা করেন শনিবার, ২২ জুমাদাল আখেরা, ১৪২০ হিজরী, মোতাবেক ২ অক্টোবর, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ।

মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৮ বছর।

যে দিন মারা যান সে দিনই ইশার সালাতের পরে তাকে দাফন দেয়া হয়।

তার সালাতে জানাযার ইমামতি করেন তার ছাত্র শাইখ ইবরাহীম শাকরাহ। জানাযায় তার ছেলেরা, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র, বন্ধু-বান্ধব ও সাধারণ মানুষ সহ প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

লাশ দাফন করা হয় উমানের রাজধানী আল হামলান নামীয় পাহাড়ে নিজ বাড়ি সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্থানে।

(আল্লাহ তাআলা শাইখ আলবানীকে অবরিত রহমত বর্ষণে সিক্ত করুন। আমীন)

দুটি কারণে শাইখের দাফন তাড়াতাড়ি দেয়া হয়ঃ

প্রথমতঃ তার ওসিয়ত বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয়তঃ শাইখের মৃত্যুর সময়কালটা ছিল খুব গরম। তাই যেন দাফন দিতে আসা লোকজনের কষ্ট না হয়ে যায় ।

যদিও শাইখের মৃত্যুর সংবাদ নিকটাত্মীয় ও কাফন-দাফনে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ কিছু লোককে ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া হয়নি এবং মৃত্যু বরণের পর দাফন করতে তেমন বিলম্বও করা হয়নি তথাপি তারা জানাযায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের সমাগম হয়। কারণ,যে ব্যক্তিই তার মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছে সেই অন্য ভাইকে এই খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

পরিশেষে দুয়া করি, ইলমে হাদীসের এই মহান খাদেমকে আল্লাহ তায়ালা যেন মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। আমীন।

জীবনী লিখেছেন, আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা বা মূলনীতিসমূহ (তামামুল মিন্না হতে)

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আল বানী রহিমাহুল্লাহ

মূল আলোচনা শুরু করার আগে অবশ্যই আমি কিছু মৌলিক কায়েদা দিয়ে ভূমিকা পেশ করবো। যে ব্যক্তি সুন্নাহর বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায়, সে এই কায়েদাগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না, বিশেষ করে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এগুলো আবশ্যক। (এজন্য আমি এই ভূমিকা পেশ করছি) যাতে করে আমরা উপযুক্ত স্থানে রেফারেন্স দিতে সক্ষম হই। আর এর মাধ্যমে আমার এবং পাঠকদের অনেক সময় বেঁচে যাবে এবং আমরা অনেক পুনরাবৃত্তি করা থেকে রেহাই পাবো, যেমনটি সম্মানীত পাঠকরাই দেখতে পাবে।

القاعدة الأولى رد الحديث الشاذ

প্রথম কায়েদাঃ শায হাদীস প্রত্যাখ্যান করা।

জেনে রেখো, সহীহ হাদীসের শর্ত হলো, সেটি যেন শায না হয়। মুহাদ্দীসগণের নিকটে সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা হলো, 'সেটি হলো সানাদযুক্ত হাদীস, যার সানাদে ন্যায়পরায়ণ রাবী থেকে আরেক ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত সানাদে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। আর সেটি শায এবং মুআল্লাহ (যার মধ্যে ইল্লত আছে) হওয়া থেকে মুক্ত'।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোতে মুরসাল, মুনকাতিঈ, শায এবং খারাপ ইল্লাতযুক্ত যেই বর্ণনাগুলোতেই কোন প্রকার দোষ রয়েছে সেই বর্ণনাগুলো থেকে সতর্কতা রয়েছে।[১]

শায হাদীস হলো গ্রহণযোগ্য বিশ্বস্ত কোন রাবীর বর্ণনা, মুহাদ্দীসগণের নিকট নির্ভরযোগ্য, তার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত বর্ণনা।[২] ইবনুছ ছলাহ (রহি) তার 'মুকাদ্দামাহ' কিতাবে এটি স্পষ্ট করেছেন। তিনি ৮৬ পৃষ্টাতে বলেন, কোন রাবী এককভাবে যদি কোন কিছু বর্ণনা করে যাতে বিতর্ক রয়েছে, আর যদি সেই একক বর্ণনার রাবীর চেয়ে বেশি মুখস্থ রয়েছে এবং বেশি মযবুত রাবীর বর্ণনার বিপরীত হয়, তাহলে তার একক বর্ণনা শায

---

[১] মুকাদ্দামাতু ইবুনিস সালাহ, ৮ পৃ.।

[২] শারহুন নুখবাহ, ইবনু হাজার, ১৩-১৪ পৃ.।

ও প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি এই একক বর্ণনা অন্যদের বর্ণনার বিপরীত না হয়, বরং সে এককভাবে সেটি বর্ণনা করেছে, কিন্তু অন্য কেউ সেটি বর্ণনা করেনি, তখন এককভাবে বর্ণনাকারী রাবীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যদি সে ন্যায়পরায়ণ, ভালো মুখস্থের অধিকারী এবং বিশ্বস্ত হয়, তাহলে তার এই একক বর্ণনাকে গ্রহণ করা হবে আর তার এককভাবে বর্ণনার কোন নিন্দ করা হবে না। আর যদি সে ভালোভাবে মুখস্থের অধিকারী এবং আয়ত্ত করার বিষয়ে বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে এই এককভাবে বর্ণনা তার জন্য লজ্জাকর এবং সেটি সহীহ হাদীসের পরিসর থেকে অনেক দূরে। তারপর সেই রাবী অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে থাকবে। যদি এককভাবে বর্ণনাকারী ভালো মুখস্থের অধিকারী, ভালোভাবে আয়ত্তকারী এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্তরের বেশি দূরে না হয়, তাহলে তার এই হাদীস হাসান বলে গণ্য হবে এবং সেটি যঈফ হাদীসের মধ্যে পড়বে না। আর যদি সেই রাবী এমন স্তর থেকে অনেক দূরের হয়, তাহলে তার একক বর্ণনাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করবো এবং সেই হাদীসে শায এবং মুনকার হাদীসের মধ্যে পড়বে।

সানাদ এবং মাতান উভয়ক্ষেত্রেই শায হতে পারে। এই দুটিরই অনেক উদাহরণ আছে। যথাস্থানে এর কিছু দৃষ্টান্ত আসবে ইনশাআল্লাহ।

القاعدة الثانية رد الحديث المضطرب

দ্বিতীয় কায়েদাঃ মুযত্বরাব[৩] হাদীস প্রত্যাখ্যান করা।

একটু আগেই যা বর্ণিত হলো তাতে জানা গেছে যে, সহীহ হাদীসের শর্তগুলোর একটি হলো যে, সেই হাদীস যেন ইল্লাত থেকে মুক্ত হয়। জেনে রেখো, ইযতিরাব (বিশৃংখলা) হলো হাদীসের ইল্লাতগুলোর একটি। মুযত্বরিব হাদীসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা (মুহাদ্দীসগণ) বলেছেন যে, সেটি হলো, যেই বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সেই বর্ণনা কোন কোন রাবী একভাবে বর্ণনা করে, আবার অন্যরা ঠিক তার বিপরীতভাবে বর্ণনা করে। যখন এই দুই বর্ণনা সমপর্যায়ের হয়, তখনই আমরা একে 'মযত্বরিব' নামে নামকরণ করি। পক্ষান্তরে যদি একটি বর্ণনা প্রাধান্যযোগ্য হয়, যেখানে অন্যটি তার সমতূল্য

[৩] এর শাব্দিক অর্থ হলো, বিশৃংখলা, এলোমেলো। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীদের বৈপরিত্য এমন পর্যায়ে পৌছে যে, বৈপরিত্যের মাঝে কোন ধরনের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়, তখন সেই হাদীসকে মুযত্বরাব হাদীস বলে।

হচ্ছে না, যেমন এক বর্ণনার রাবীর মুখস্থ বেশি অথবা যার থেকে সে বর্ণনা করছে তার সান্নিধ্যে (অন্য রাবীর চেয়ে) সে বেশি থেকেছে, এছাড়াও প্রাধান্য দেয়ার নির্ভরযোগ্য যে উপায়গুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে কোন একটি বর্ণনা যদি প্রাধান্য পায়, তাহলে প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনার ওপরই হুকুম প্রয়োগ হবে। আর তখন সাধারণভাবে মুযত্বরিব হাদীসের বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ হবে না এবং তার হুকুমও আসবে না।

ইযতিরাব হাদীসের সানাদ এবং মাতান উভয় স্থানেই হতে পারে। এছাড়াও এক রাবীর ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার অনেক রাবীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। ইযতিরাব হাদীসের যঈফ হওয়াকে আবশ্যক করে। কেননা এটি ইঙ্গিত করে যে, সেই রাবী হাদীসটি ভালোভাবে আয়ত্ব করেনি।[৪]

তারপর তিনি (ইবনুস সালাহ) উদাহরণ হিসেবে (সুতরার জন্য সামনের দিক দিয়ে) রেখা টানা সম্পর্কীত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেটিকে লেখক (ফিকহুস সুন্নাহর লেখক) শক্তিশালী বর্ণনা বলেছেন। আর ইনশাআল্লাহ অচিরেই সুতরাহ অধ্যায়ে এর রদ আসছে।

القاعدة الثالثة رد الحديث المدلس

তৃতীয় কায়েদাঃ মুদাল্লাস[৫] হাদীস প্রত্যাখ্যান করা।

তাদলীস তিন প্রকার।

১. তাদলীসুল ইসনাদ (تدليس الإسناد): রাবী এমনজনের থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন, যার সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে, কিন্তু তিনি তার থেকে সেই হাদীস শুনেননি। (কিন্তু তিনি এমনভাবে বর্ণনা করেন যে,) মনে হয় তিনি তার নিকট থেকে শুনেছেন। আর এই দুই ব্যক্তির মাঝে এক বা একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে। (যেহেতু তিনি সেই ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেননি) তাই তিনি এভাবে বলেন না যে, আমাদেরকে অমুক ব্যক্তি জানিয়েছেন অথবা আমাদেরকে অমুক

[৪] আল মুকাদ্দামাহ, ১০৩-১০৪ পৃ.।

[৫] এটি তাদলীস শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো ত্রুটি গোপন রাখা। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীসকে একজন রাবী তার শাইখের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তিনি তা তার এই শাইখের নিকট থেকে শুনেননি। যদিও তিনি অন্য অনেক হাদীস এই শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন। এরকম হাদীসকে ‘মুদাল্লাস’ হাদীস বলে।

ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন ইত্যাদি। বরং তিনি বলেন, অমুক বলেছেন অথবা অমুক থেকে বর্ণিত হয়েছে ইত্যাদি। এমন সীগাহ দিয়ে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় তিনি তার থেকে শুনেছেন।

২. তাদলীসুশ শুয়ূখ (تدليس الشيوخ): সেটি হলো রাবী তার শাইখের নিকট থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করছে যেটি তার থেকে তিনি শুনেছেন। কিন্তু তিনি তার শাইখের এমন নাম অথবা উপনাম অথবা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন যাতে তাকে চেনা না যায়।

৩. তাদলীসুত তাসবিয়্যাহ (تدليس التسوية): মুদাল্লিস ব্যক্তি (যে ব্যক্তি ত্রুটি গোপন রাখে) এমন হাদীস বর্ণনা করে যা সে তার বিশ্বস্ত শাইখের নিকট থেকে শুনেছে। কিন্তু সেই বিশ্বস্ত শাইখ কোন যঈফ শাইখের নিকট থেকে সেই হাদীসটি শুনেছে। আর সেই যঈফ শাইখ কোন বিশ্বস্ত শাইখের নিকট থেকে সেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখন মুদাল্লিস ব্যক্তি, যে বিশ্বস্ত শাইখের নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছে সে তার শাইখের শাইখ অর্থাৎ যঈফ শাইখের নামটি দূর করে দিয়ে বিশ্বস্ত শাইখের থেকে বিশ্বস্ত শাইখের বর্ণনা বানিয়ে দেয়। আর সে এক্ষেত্রে অন্যান্য সম্ভাবনাময় শব্দ ব্যবহার করে। যেমন عنعنة অর্থাৎ অমুকের থেকে অমুক বর্ণনা করেছে, ইত্যাদি। ফলে এই সানাদের সকলেই বিশ্বস্ত হয়ে যায়। যার ফলে সেই সানাদে তখন আর কেউ অগ্রহণযোগ্য থাকে। তবে ইল্লাত সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিরাই এটি বুঝতে পারে। একারণে এটিই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের তাদলীস, তারপর পথমটি (তাদলীসুল ইসনাদ), তারপর দ্বিতীয়টি (তাদলীসুশ শুয়ূখ)।[৬]

যার থেকে তাদলীস প্রমাণিত হয়েছে তার বিধান হলো, যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে যেই হাদীস শোনার ব্যাপারে সে স্পষ্টভাবে বলবে, শুধু সেটিই গ্রহণ করা হবে। আর কোন কোন আলেম সাধারণভাবে তার কোন হাদীসই গ্রহণ করেন না। তবে প্রথমটিই বেশি সঠিক, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন।[৭] যে ব্যক্তি চায়, সে 'আল মুছত্বলাহ' কিতাব পড়তে পারে।

[৬] আল মুকাদ্দামাহ এর ব্যাখ্যা, হাফিয আল ইরাকী, ৭৮-৮২ পৃ.।

[৭] শারহুন নুখবাহ, ১৮ পৃ.।

القاعدة الرابعة رد حديث المجهول

চতুর্থ কায়েদা: মাজহূল[৮] রাবীর হাদীস প্রত্যাখ্যান করা।

খতীব বাগদাদী (রহি) 'আলা কিফায়াহ' কিতাবের ৮৮ পৃষ্ঠাতে বলেন, মুহাদ্দীসগণের নিকটে মাজহূল হলো, যে রাবী জ্ঞানার্জনের দ্বারা নিজে প্রসিদ্ধ নয়, আলেমগণও তাকে চিনে না এবং শুধু একজন রাবী থেকে যার হাদীস জানা যায়।

সর্বনিম্ন যেটির মাধ্যমে তার জাহালাত বা অপরিচিতি উঠে যাবে তাহলো, জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন সেই ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করবে।

আমি (আলবানী) বলছি, তবে তার থেকে সেই দুই ব্যক্তির হাদীস বর্ণনা করার দ্বারাই সেই ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে না। যদিও একদল আলেম মনে করেন যে, এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে।

তারপর খত্বিব বাগদাদী (রহি) তাদের কথা যে সঠিক নয় এই বিষয়ে তিনি তারপরে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে তা বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি চায়, সে সেখান থেকে পড়ে নিতে পারে।

আমি (আলবানী) বলছি, যার থেকে মাত্র একজন হাদীস বর্ণনা করেছে সেই মাজহূল রাবী 'মাজহূলুল আইন' নামে পরিচিত। আর তার থেকে এই জাহালাত বা অপরিচিতি উঠে যাবে যদি তার থেকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে। তখন সে পরিচিত হবে 'মাজহুলুল হাল' এবং 'মাসতূর' নামে। একদল আলেম কোন ধরনের শর্ত ছাড়াই মাজহূল রাবীর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে 'শারহুন নুখবাহ' কিতাবে। এই কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠাতে ইবনু হাজার (রহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, মাসতূর রাবীর বর্ণনাসহ অনুরূপ বর্ণনা যাতে (সেটি গ্রহণীয় এবং অগ্রহনীয় হওয়ার) সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করাও যাবে না, আবার তা গ্রহণ করাও যাবে না। বরং সেই বর্ণনা সেই রাবীর অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার ওপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ রাবীর অবস্থা স্পষ্ট হলে সেই বর্ণনা গ্রহণ করা হবে, নইলে নয়), যেমনটি ইমামুল হারামাইন দৃঢ়ভাবে বলেছেন।

---

[৮] এর অর্থ হলো, অপরিচিত, অচেনা। পারিভাষিক অর্থে, যে রাবীর নাম ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না তাকে মাজহূল বলা হয়।

আমি (আলবানী) বলছি, যেই ইমামের (কোন রাবীকে) বিশ্বস্ত বলার ওপর নির্ভর করা যায় এমন ইমাম তাকে (মাজহূল রাবীকে) বিশ্বস্ত বলার দ্বারা আমাদের কাছে তার অবস্থা স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এমন কথার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'মাজহূলুল হাল' হলো, যার থেকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছে, কিন্তু তিনি (রহি) তাকে (মাজহূল রাবীকে) বিশ্বস্ত বলেননি। আর আমি বলেছি, যেই ইমামের বিশ্বস্ত বলার ওপর নির্ভর করা যায়। কেননা এমন কিছু মুহাদ্দীস রয়েছেন, যাদের বিশ্বস্ত বলার ওপর নির্ভর করা যায় না। কেননা তারা অধিকাংশ আলেম থেকে ব্যতিক্রম করে মাজহূল রাবীকেও বিশ্বস্ত বলেছেন। তাদের মধ্যে আছেন, ইবনু হিব্বান (রহি)। এটি আমি পরের কায়েদাতে বর্ণনা করেছি।

হ্যাঁ, মাজহূল রাবীর বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে, যখন একদল বিশ্বস্ত রাবী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করবে এবং সেই হাদীসে অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রকাশ না পাবে। আর এর ওপরই পরবর্তী হাফিযগণের আমল বিদ্যমান। তারা হলেন, ইবনু কাসীর, আল ইরাকী, ইবনু হাজার আসকালানীসহ আরো অন্যান্যরা।

القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

পঞ্চম কায়েদাঃ ইবনু হিব্বান (রহি) এর (কোন রাবীকে) বিশ্বস্ত বলার ওপর নির্ভর না করা।

একটু আগের বর্ণনা থেকে তুমি জানতে পেরেছো যে, অধিকাংশ আলেমের নিকটে দুই প্রকার মাজহূল রাবীর কারো হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ইবনু হিব্বান (রহি) অধিকাংশ আলেমের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তিনি মাজহূল রাবীর হাদীস গ্রহণ করেছেন, তা দিয়ে দলীল পেশ করেছেন এবং তার 'সহীহ ইবনু হিব্বান' কিতাবে সেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহি) 'লিসানুল মীযান' কিতাবে বলেন, ইবনু হিব্বান (রহি) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে, তার বর্ণনাকে যাচাই করা ছাড়া সঠিক বলা জায়িয নয়। আর যদি অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী হয়, কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত রাবীদের মতোই বর্ণনা করে, তাহলে সে বিশ্বস্ত বলেই গণ্য হবে এবং তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মানুষের কথা সাধারণভাবে সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ গণ্য করা হয়ে থাকে, যতক্ষণ তিরষ্কারকে আবশ্যক করে এমন কিছু প্রকাশ না

পায়। (প্রকাশ পেলে) তখন যা প্রকাশ পাবে সেই অনুযায়ীই তার সাথে আচরণ করা হবে। এটি হলো প্রসিদ্ধ রাবীদের বিধান। পক্ষান্তরে যেসব মাজহূল রাবীদের থেকে যঈফ রাবীরা ছাড়া আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি, তারা সর্বাবস্থায় বর্জনীয়।[৯]

তারপর হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন,

আমি (ইবনু হাজার) বলছি, ইবনু হিব্বান (রহি) যেদিকে গিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি 'মাজহূলুল আইন' না হয়, তাহলে সে ন্যায়পরায়ণ হবে, যতক্ষণ তার দোষ ত্রুটি স্পষ্ট না হবে। এটি আশ্চর্যকর মত। আর অধিকাংশ আলেমের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটিই হলো হিব্বান (রহি) এর রচিত 'কিতাবুছ ছিকাত' এ তার মাসলাক। তিনি সেখানে এমন ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছেন, যাদের সম্পর্কে আবূ হাতিম (রহি) সহ আলো অন্যান্যরা বলেছেন যে, তারা মাজহূল। আর ইবনু হিব্বান (রহি) এর মতে মাজহূল রাবী থেকে একজন প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করলেই তার থেকে 'মাজহূলুল আইন' উঠে যায়। আর এটি তার শাইখ ইবনু খুযাইমাহ (রহি) এরও মত। কিন্তু অন্য আলেমদের মতে, সেই রাবীর 'মাজহূলুল হাল' তখনো অশিষ্ট থাকে। এই সবগুলোই হলো হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এর কথা।

ইবনু হিব্বান (রহি) এর থেকে আশ্চর্যকর বিষয় হলো, এই অপ্রাধান্যযোগ্য কায়েদাহর ওপর ভিত্তি করে তিনি তার পূর্বে বর্ণিত কিতাবে একদল রাবীর নাম বর্ণনা করে তিনি নিজেই তাদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে এবং তাদের পিতাদেরকে চিনেন না।

তারপর তিনি তৃতীয় স্তরের রাবীদের সম্পর্কে বলেন, সাহল বর্ণনা করেন শাদ্দাদ ইবনুল হাদী থেকে, আর তার থেকে বর্ণনা করেন আবূ ইয়া'ফূর, কিন্তু আমি তাকে চিনি না এবং আমি তার পিতাকেও চিনি না।

যে ব্যক্তি আরো বেশি উদাহরণ নিতে চায়, সে যেন 'আছ ছরিমুল মানকী' (৯২-৯৩ পৃ.) কিতাবটি পড়ে।

সেখানে এই উদাহরণটি উল্লেখ করার পরে লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান (রহি) এই ধরনের অনেক রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। আর এই কিতাবে তার পদ্ধতি হলো, যার দোষ ত্রুটি সম্পর্কে জানেন না তার নামও বর্ণনা করেছেন। আর যদি সেই রাবী মাজহূল হয়, তাহলে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন

---

[৯] আয যুআফা, ২/১৯২-১৯৩।

না (তারপরও তিনি তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন)। আর এই সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত এবং এটি জেনে রাখা দরকার যে, এই কিতাবে কোন ব্যক্তির শুধু নাম বর্ণনা করে ইবনু হিব্বান (রহি) এর বিশ্বস্ত বলা হলো, বিশ্বস্ত বলার সবচেয়ে নিম্নস্তর।

এজন্য ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার (রহি) সহ আরো অন্যান্য মুহাক্কিক মুহাদ্দীসদেরকে আমরা দেখতে পাই যে, (কোন রাবী সম্পর্কে) শুধু ইবনু হিব্বান (রহি) বিশ্বস্ত বললে তারা সেই রাবীকে বিশ্বস্ত বলেন না। আর যঈফ হাদীসের ওপর আলোচনার সময়ে এই ধরনের অনেক উদাহরণ আসবে, যেই যঈফ হাদীসগুলোকে লেখক (ফিকহুস সুন্নাহর লেখক) নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন আর সেই হাদীসের রাবীগুলোর মাঝে এমনও মাজহূল রাবী আছে যাদেরকে শুধু ইবনু হিব্বান (রহি) বিশ্বস্ত বলেছেন।

আর এই বিষয়ে সতর্ক করা উচিত যে, ইবনু আব্দিল হাদীর কথা যে, 'আর যদি সেই রাবী মাজহূল হয় তাহলে তিনি (ইবনু হিব্বান) সেই রাবীর অবস্থা সম্পর্কে জানেন না' এই কথাটি সুক্ষ্ম নয়। কেননা তাহলে 'মাফহুমুল মুখালাফাহ' থেকে বুঝা যায় যে, 'সিকাহ' কিতাবে ইবনু হিব্বান (রহি) এর পদ্ধতি হলো, যে রাবী 'মাজহূলুর আইন' তাকে তিনি সেই কিতাবে বর্ণনা করেননি। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। কেননা পূর্বে বর্ণিত 'সাহল' এর বর্ণনাটি এর প্রমাণ যে, ইবনু হিব্বান (রহি) বলেছেন, 'আমি তাকে চিনি না এবং তার পিতাকেও চিনি না'। (অর্থা' এখানে তিনি মাজহূলুর আইন রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করছেন। ফলে ইবনু আব্দিল হাদীর কথাটি সূক্ষ্ম নয়)। এর মতো আরো উদাহরণ সামনেই আসছে।

অনুরূপভাবে ইবনু হাজার (রহি) এর এই কথাটিও সূক্ষ্ম নয় যে, 'একজন প্রসিদ্ধ রাবীর বর্ণনার মাধ্যমে (সেই রাবী থেকে 'মাজহুলুল আইন' উঠে যাবে)'। কেননা এটির দ্বারা মনে হবে যে, যে রাবীর থেকে একজন প্রসিদ্ধ রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইবনু হিব্বান (রহি) বিশ্বস্ত বলেননি। ইবনু হাজারের এই কথা দিয়ে যদি বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি 'সিকাহ' কিতাবে যা রয়েছে তার অনেক কিছুর বিপরীত (কেননা সিকাহ কিতাবে বিশ্বস্ত ছাড়া মাজহূল রাবীও রয়েছে)। আর যদি এটি ছাড়া অন্যটি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার কোন মূল্য নেই। কেননা হয় সেই রাবী যঈফ হবে অথবা মাজহূল হবে। আর 'সিকাহ' কিতাবে এই দুই ধরনের রাবীই রয়েছে।

সেই কিতাবের তাবেঈগণের স্তর থেকে কিছু উদাহরণ নাও।

১. ইবরাহীম ইবনু আব্দুর রহমান আল উযরী।

ইবনু হিব্বান (রহি) সিকাহ (৪/১০) কিতাবে তার সম্পর্কে বলেন, তিনি মুরসাল হাদীসগুলো বর্ণনা করেন। আর তার থেকে বর্ণনা করেন মাআন ইবনু রিফাআহ।

তারপর ইবনু হিব্বান (রহি) তার থেকে মুরসাল সানাদে বর্ণনা করেন যে, (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন), প্রত্যেক আগত জামাআতের মধ্যে নেক, তাকওয়া সম্পন্ন মানুষ (কুরআন ও সুন্নাহর) এই জ্ঞান গ্রহণ করবেন। আর তারাই এই জ্ঞানের মাধ্যমে (কুরআন সুন্নাহতে) সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিলপন্থিদের মিথ্যা অপবাদ এবং জাহিল অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বিদূরিত করবেন।[১০]

আমি (আলবানী) বলছি, এই মাআনের সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার নিজেই বলেছেন যে, সে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

ইমাম যাহাবী (রহি) বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়, আর বিশেষভাবে সে একজনের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করে আর এই ইবরাহীম কে তা জানা যায় না। সুতরাং সে 'মাজহূলুল আইন'। আর ইবনু হিব্বান (রহি)ও এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি 'আয যুআফা' (৩/৩৬) কিতাবে মাআনের জীবনীতে তার সম্পর্কে বলেন, সে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। আর সে অনেক মুরসাল হাদীস বর্ণনা করে। এছাড়াও সে মাজহূল রাবীদের নিকট থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করে যেগুলো বিশ্বস্ত রাবীদের হাদীসের মতো নয়।

২. ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল।

ইবনু হিব্বান 'সিকাহ' (৪/১৪-১৫) কিতাবে তার সম্পর্কে বলেন, সে আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে আর তার থেকে বর্ণনা করেছে হাজ্জাজ ইবনু ইয়াসার।

আমি (আলবানী) বলছি, এই হাজ্জাজ, তাকে ইবনু উবাইদও বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, সে মাজহূল।

তারও আগে আবূ হাতিম (রহি)সহ আরো অন্যান্যরা এমনটিই বলেছেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে 'আল মীযান' কিতাবে। ইমাম যাহাবী (রহি) তার

---

[১০] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, হা/২০৯১১।

সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার থেকে লাইছ ইবনু আবী সুলাইম এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর এই লাইছ হলো যঈফ রাবী। আর এটি প্রসিদ্ধ, এমনকি ইবনু হিব্বান (রহি) এর নিকটেও এটি প্রসিদ্ধ।

৩. ইবরাহীম আল আনসারী।

ইবনু হিব্বান 'সিকাহ' (৪/১৫) কিতাবে তার সম্পর্কে বলেন, সে মাসলামাহ ইবনু মাখলাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে তার ছেলে ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম।

আমি (আলবানী) বলছি, এই ইসমাঈল হলো মাজহূল রাবী, যেমনটি ইবনু হাজার (রহি) এবং তারও আগে আবূ হাতিম (রহি) বলেছেন।

সুতরাং এই তাহকীক থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে, ইবনু হিব্বান (রহি) এর নিকটে কোন মাজহূল রাবী থেকে একজন হাদীস বর্ণনা করলেই, তার থেকে 'মাজহুলুল আইন' উঠে যায়, যদিও সেই বর্ণনাকারী রাবী যঈফ অথবা মাজহূল হয়। কিন্তু এটি পূর্বে বর্ণিত ইবনু হাজার (রহি) এর বাহ্যিক কথার বিপরীত, যদিও ইবনু হাজার (রহি) দৃঢ়ভাবে তা বলেননি। তিনি বলেছেন, ইবনু হিব্বান (রহি) যেন বলছে, আর এটি তিনি ইবনু হিব্বানের কথা থেকেই গ্রহণ করেছেন, যেই কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, (ইবনু হিব্বান বলেছেন) 'এটি হলো প্রসিদ্ধ রাবীদের বিধান। পক্ষান্তরে যেসব মাজহূল রাবীদের থেকে যঈফ রাবীরা ছাড়া আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি, তারা সর্বাবস্থায় বর্জনীয়।' দ্বিতীয় উদাহরণ দ্বারা এটি বাতিল হয়ে যায়, যেমনটি বাহ্যতই বুঝা যাচ্ছে।

সারকথা হলো, ইবনু হিব্বান (রহি) এর নিকটে শুধু 'মাজহূলুল আইন' ক্রুটি নয়। তার কিতাব 'আয যুআফা' পড়ার পরে এই বিষয়ে আমার ইয়াকীন আরো বেড়ে গেছে। সেই কিতাবে মাজহূল রাবীর সংখ্যা প্রায় ১৪০০। কিন্তু আমি তাদেরকে কারো ক্ষেত্রেই দেখিনি যে, ইবনু হিব্বান (রহি) তাদের কাউকে মাজহূল বলে দোষারোপ করেছেন। হে আল্লাহ! তবে তাদের মধ্যে চারজনকে তিনি দোষারোপ করেছেন। কিন্তু তাদের মুনকার বর্ণনার কারণে তাদেরকে দোষারোপ করেছেন, মাজহূল হওয়ার কারণে নয়। এখানে তাদের নাম এবং তাদের সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরা হলো।

১. হুমাইদ ইবনু আলী ইবনু হারূন আল কায়সী।

ইবনু হিব্বান (রহি) 'আয যুআফাহ' (১/২৬৩-২৬৪) কিতাবে তার কিছু মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, তার এই ধরনের বর্ণনার পরে এই বিশ্বস্ত

রাবীদেরকে বাদ দিয়ে তার বর্ণনা দিয়ে দলীল পেশ করা জায়িয নয়। আর এই শাইখকে কেউই চিনে না।

২. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী লাইলা আল আনাছারী।

ইবনু হিব্বান (রহি) 'আয যুআফাহ' (২/৫) কিতাবে তার সম্পর্কে বলেন, এই ব্যক্তি মাজহূল। তার এই মুনকার বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন বর্ণনা আছে বলে আমি জানি না, যেই বর্ণনা মুসলিমদের সকলেই ঐকমত্যে বাতিল প্রমাণিত হয়।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ইবনু সুলাইম।

ইবনু হিব্বান (রহি) 'আয যুআফাহ' (২/৭) কিতাবে তার সম্পর্কে বলেন, এই শাইখ মাজহূল। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ। বাকিয়্যাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে তার বর্ণনা আমার মুখস্থ নেই। আর এই কিতাবের শুরুতেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, বাকিয়্যাহ যঈফ। তাই সে যা বর্ণনা করেছে এখানে তার নিন্দা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তার বর্ণনা সর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

৪. আবূ যায়িদ।

ইবনু হিব্বান (রহি) 'আয যুআফাহ' (৩/১৫৮) কিতাবে তার সম্পর্কে বলেন,

আবূ যায়িদ হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু মাসউদ রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে। কিন্তু এই আবূ যায়িদ কে তা জানা যায় না। এছাড়াও তার পিতা এবং তার শহর সম্পর্কেও জানা যায় না। কোন মানুষের যখন এমন বৈশিষ্ট্য হয়, আর যখন সে একটিই মাত্র বর্ণনা করে যেটি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং রায়ের বিপরীত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা কর্তব্য এবং তার বর্ণনা দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে না।

এখানে ইবনু আব্দিল হাদী (রহি) এর কথাটি আবার বর্ণনা করছি যেটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু হিব্বান (রহি) এর (সিকাহ কিতাবে) পদ্ধতি হলো, যার দোষ ত্রুটি সম্পর্কে জানেন না তার নামও বর্ণনা করেছেন। আর যদি সেই রাবী মাজহূল হয়, তাহলে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন না (তারপরও তিনি তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন)।

কিন্তু পূর্বে বর্ণিত উদাহরণগুলোর কারণে (তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন না, এভাবে না বলে) এভাবে বলা সঠিক যে, সে তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনে না।

সারকথা হলো, ইবনু হিব্বান (রহি) এর বিশ্বস্ত বলাকে অবশ্যই অনেক সাবধানতা ও সতর্কতার অবলম্বণ করার পরেই তা গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু মাজহূল রাবীদেরকে বিশ্বস্ত বলাতে আলেমদের থেকে তার বিপরীত অবস্থান রয়েছে।

কিন্তু এটি সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে বলা যাবে না, যেমনটি আল্লামাহ আল মু'আল্লিমী তার 'আত তানকীল' (১/৪৩৭-৪৩৮) কিতাবে বর্ণনা করেছেন যাতে আমার টীকা রয়েছে। আর শাইখ হাবাশীর ওপর আমার রদ্দ বিষয়ক আলোচনাটিও পুনরায় পাঠ করতে পারো। মাজহূল রাবীদের সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (রহি) এর বিশ্বস্ত বলার ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন শাইখ হাবাশী।

এছাড়াও যেই বিষয়ে সতর্ক করা আবশ্যক, তা হলো, আল মুআল্লিমী (রহি) যেটি বর্ণনা করেছেন তার সাথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যোগ করা উচিত, যেটি আমি এই জ্ঞান অনুশীলন করে জেনেছি, যা সম্পর্কে খুব ব্যক্তিই সতর্ক করে এবং অধিকাংশ ছাত্ররাই এটি থেকে উদাসীন। আর সেটি হলো, ইবনু হিব্বান (রহি) যে রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন, তার থেকে যদি একদল বিশ্বস্ত রাবী হাদীস বর্ণনা করে, আর সেই রাবী যদি মুনকার বা অপছন্দীয় কোন বর্ণনা না করে, তাহলে সেই রাবী সত্যবাদী এবং তাকে দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে।

এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে আমি এই ধরনের কিছু হাদীসকে শক্তিশালী বলেছি। যেমন সালাতে (কোন কিছুর ওপর) ভর দিয়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কীত হাদীস। ফলে কিছু তরুন ছাত্ররা এটি মনে করছে যে, আমি নিজেই তো এর (এই কায়েদার) উল্টা করেছি এবং ইবনু হিব্বানের শায বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে তার মতো হয়েছি। ইনশাল্লাহ অচিরেই দশজন রাবীর কথা উল্লেখ করে এর বিস্তারিতভাবে রদ সামনে আসছে, যেই রাবীদেরকে শুধু ইবনু হিব্বান (রহি) বিশ্বস্ত বলেছেন, আর ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী (রহি) তারা উভয়েই তার অনুসরণ করেছেন। এই বিষয়টি 'কায়ফিয়্যাতুর রফয়ি মিনাস সুজূদ' (পৃ. ১৯৭) এই আলোচনাতে তালাশ করো।

القاعدة السادسة قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

ষষ্ঠ কায়েদাঃ (কোন হাদীসের) রাবীগুলো 'রিজালুস সহীহ'[১১] হলেই সেই হাদীস সহীহ হয় না।

প্রথম কায়েদা থেকে তুমি সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা জানতে পেরেছো। সহীহ হাদীসের শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত হলো, সেই হাদীসটি ইল্লাত থেকে মুক্ত হওয়া। সেই ইল্লাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো, শায, মুযত্বরিব এবং মুদাল্লাস হওয়া, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, কিছু মুহাদ্দীস কোন হাদীস সম্পর্কে বলে থাকেন যে, এই হাদীসের রাবীগুলো 'রিজালুস সহীহ' অথবা এর রাবীগুলো বিশ্বস্ত ইত্যাদি এই কথাগুলো 'এই হাদীসের সানাদ সহীহ' এই কথার সমান নয়। কেননা 'এই হাদীসের সানাদ সহীহ' এই কথাতে হাদীস সহীহ হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে, যেই শর্তগুলোর একটি হলো ইল্লাত থেকে মুক্ত হওয়া। পক্ষান্তরে প্রথম কথাটিতে এই সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে না। বরং শুধু একটি শর্ত থাকে, সেটি হলো রাবীর ন্যায়পরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকা। আর শুধু এটির মাধ্যমে হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হয় না, যেমনটি কারো কাছেই গোপন নয়।

এখানে আরেক লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেটি হলো, পূর্বে বর্ণিত ইল্লাত থেকে কোন মুক্ত হলেও (অর্থাৎ সেই হাদীসের সকল রাবী 'রিজালুস সহীহ' হলেও) সেটি সহীহ হবে না। কেননা হতে পারে সেই হাদীসের সানাদে এমন রাবী রয়েছে, যেই রাবী 'রিজালুস সহীহ', কিন্তু তাকে দিয়ে দলীল পেশ করা হয়নি। বরং তাকে শুধু অন্য রাবীর প্রমাণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে অথবা অন্য রাবীর সাথে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সেই রাবী মুখস্থশক্তিতে দুর্বল অথবা তাকে শুধু ইবনু হিব্বান (রহি) বিশ্বস্ত বলেছেন। আর অনেক স্থানে কিছু মুহাক্কীক তাদের কথা যে, 'এই হাদীসের রাবীগুলো বিশ্বস্ত' এটি দিয়ে তারা এমন বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এটিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের কাউকে বিশ্বস্ত বলাতে শিথিলতা রয়েছে। এই সবগুলোই তোমাকে তাদের কথার সঠিকতা বুঝতে বাধা দিবে, যেমনটি আমরা বর্ণনা করলাম।

আর লেখক (ফিকহুস সুন্নাহর লেখক) মনে হয় এই বিষয়টি লক্ষ করেননি। যার ফলে তিনি কিছু মুহাক্কীকের এমন কথার ওপর নির্ভর করেই অনেক হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর অচিরেই আমরা এই বিষয়কে জানাবে এমন অনেক টীকা দেখতে পারো।

---

[১১] যে রাবীদেরকে ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারীতে এবং ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন।

তারপর আমার কিতাব ‘সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব’ (৩৯-৪৬ পৃ.) এই কিতাবে এই কায়েদাতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং সেখান থেকে এটি পড়ে নিবে। কেননা এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

القاعدة السابعة عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

সপ্তম কায়েদাঃ (কোন হাদীস সম্পর্কে) আবূ দাউদ (রহি) এর নীরব থাকার ওপর নির্ভর না করা।

আবূ দাউদ (রহি) এর সম্পর্কে এই কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, তিনি তার ‘সূনান আবূ দাউদ’ কিতাবের সঠিকতা সম্পর্কে বলেছেন যে,

আমার এই কিতাবের যেই হাদীসে অনেক বেশি দুর্বলতা রয়েছে তা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি। আর যেই হাদীসের সম্পর্কে আমি কোন কিছু বর্ণনা করিনি সেই হাদীসটি সঠিক।

আবূ দাউদ (রহি) এর কথা যে, ‘সেটি সঠিক’ এর উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

কোন কোন আলেমের মতে, এটি দিয়ে ইমাম আবূ দাউদ (রহি) এর উদ্দেশ্য হলো, সেই হাদীসটি হাসান, যেটি দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে।

আর অন্য আলেমগণের মতে, এটি দিয়ে এর চেয়ে আরো আম বা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং যেই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা যায় এবং যেই হাদীস যঈফ হলেও তা (অন্য হাদীসের) প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায়, কিন্তু তাতে অনেক বেশি দুর্বলতা নেই, এই সবগুলোই বর্ণনাই ইমাম আবূ দাউদ (রহি) এর কথার অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই হলো সঠিক মত। কেননা ইমাম আবূ দাউদ (রহি) এর কথাতে এর লক্ষণ রয়েছে। তা হলো, তিনি বলেছেন, ‘যেই হাদীসে অনেক বেশি দুর্বলতা রয়েছে তা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি’। এটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেই হাদীসগুলোতে অনেক বেশি দুর্বলতা নেই সেগুলো

তিনি বর্ণনা করেননি। সুতরাং এটি প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আবূ দাউদ (রহি) যেই হাদীসগুলোতে নীরব থেকেছেন তার সবগুলোই হাসান হাদীস নয়। এর প্রমাণ হলো তাতে এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো যঈফ হওয়ার বিষয়ে কোন আলেম সন্দেহ করবে না, অথচ সেগুলোর বিষয়ে তিনি নীরব রয়েছেন। এমনকি ইমাম নববী (রহি) কোন কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন যে, ইমাম আবূ দাউদ (রহি) স্পষ্টভাবে এই হাদীসের দুর্বলতার কথা বলেননি। কারণ এটি স্পষ্ট (যে, এটি যঈফ)।

এরপরেও ইমাম নববী (রহি) অনেক হাদীসের সানাদ যাচাই না করেই ইমাম আবূ দাউদ (রহি) যেগুলোতে নীরব থেকেছেন সেগুলোর অনেক বর্ণনা দিয়ে তিনি দলীল পেশ করেছেন। যার ফলে তার অনেক ত্রুটি হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহি) সম্পর্কে আমরা যেমনটি বুঝেছি সেটিকে ইবনু মান্দাহ, ইমাম যাহাবী, ইবনু আব্দুল হাদী এবং ইবনু কাসীর (রহি), এদের মতো মুহাক্কীক আলেমগণ প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আমার কিতাব ‘সহীহ আবূ দাউদ’ এই কিতাবে আমি তাদের সেই কথাগুলো বর্ণনা করেছি।

তারপর আমি এই মাসআলাতে হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এর কথা জানতে পেরেছি। আর আমরা যেমনটি বর্ণনা করেছি তিনি সেই মতের দিকেই গিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর পক্ষে দলীল পেশ করেছেন, যা তুমি অন্য কারো নিকটে পাবে না। যদি আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয় না থাকতো, তাহলে আমি এখানে সেটি উল্লেখ করতাম। কিন্তু এখানে শুধু মূল কিতাবের রেফারেন্স দিয়েই ক্ষান্ত হলাম। কিতাবটি হলো ইমাম সান‘আনী (রহি) এর ‘তাওযীহুল আফকার লি মাআনী তানকীহিল আনযার’ (১/১৯৬-১৯৯)।

القاعدة الثامنة رموز السيوطي في "الجامع الصغير" لا يوثق بها

অষ্টম কায়েদা: ‘আল জামিউস সগীর’ কিতাবে ইমাম সুয়ূতীর সংকেতচিহ্নকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না।

কোন হাদীস সহীহ অথবা হাসান অথবা যঈফ হওয়া নির্দেশক ইমাম সুয়ূতী (রহি) এর সংকেতচিহ্নের ওপর নির্ভর করা অনেক আলেমের নিকটে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। আর সেই আলেমগণেরই অনুসরণ করেছেন শাইখ সায়্যিদ সাবিক (রহি)। কিন্তু আমরা এই সংকেতচিহ্নকে দুটি কারণে অগ্রহণযোগ্য মনে করি।

১. নুসখাগুলোর সংকেতচিহ্নগুলোতে বিকৃতি করা হয়েছে। কেননা তুমি অনেক হাদীসে এমন সংকেতচিহ্ন দেখতে পাবে, যা এই কিতাবের ব্যাখ্যাকার আল মানাবী (রহি) স্বয়ং ইমাম সুয়ূতী (রহি) থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার বিপরীত। আর ব্যাখ্যাকার বর্ণনা করেছেন লেখক ইমাম সুয়ূতী (রহি) এর নিজের হাতের লেখা আল জামে কিতাব থেকে, যেমনটি তিনি তার ব্যাখ্যার শুরুর দিকে স্পষ্টভাবে বলেছেন। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন,

কিছু নুসখাতে হাদীস সহীহ, হাসান এবং যঈফ নির্ধারণে যে 'সদ', 'হা' এবং 'যদ' বর্ণ দিয়ে সংকেতচিহ্ন পাওয়া যায়, সেগুলোর ওপর নির্ভর করা উচিত হবে না। কেননা কিছু নুসখা ছাড়া অন্যগুলোতে বিকৃতি করা হয়েছে, যেমনটি আমরা ইমাম সুয়ূতী (রহি) এর নিজের হাতে লেখা নুসখার সাথে মিলিয়ে দেখেছি।

২. ইমাম সুয়ূতী (রহি) এর হাদীসের সহীহ যঈফ নির্ধারণে শীথিলতা থাকার বিষয়টি সুপরিচিত। যেই হাদীসগুলোকে তিনি সহীহ অথবা হাসান বলেছেন, সেগুলোর মধ্যে এক বিরাট অংশ ব্যাখ্যাকার আল মানাবী (রহি) প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সেই হাদীসগুলোর সংখ্যা কয়েকশত হবে, বরং এর চেয়েও বেশি হবে। অনুরূপভাবে সেই কিতাবে অনেক মাওযু হাদীসও রয়েছে। অথচ ইমাম সুয়ূতী (রহি) সেই কিতাবের ভূমিকাতে বলেন, 'যেই হাদীসগুলোকে শুধু মাওযু হাদীস বর্ণনাকারী এবং মিথ্যাবাদী রাবীরা বর্ণনা করেছে, সেগুলো থেকে আমি এই কিতাবকে সংরক্ষণ করেছি'।

আমি সেগুলোকে তাড়াহুড়ো করে যাচাই করেছি। সেগুলোর সংখ্যা হলো কিছু কমবেশি এক হাজার। আর আমি সেগুলো পুনরায় যাচাই করতে, সেগুলোর ওপর তাহকীক অব্যহত রাখতে এবং মানুষদের জন্য তার তাখরীজ করতে তাওফীক চাচ্ছি। আর এটি আশ্চর্যকর যে, অন্য কিতাবে ইমাম সুয়ূতী নিজেই সেই হাদীসগুলোর একটি বিরাট অংশকে মাওযূ বলেছেন। এই সবগুলো বিষয় সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করে দেয়। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সহজ করেছেন। যার ফলে 'আল জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু' যেটি নামকরণ করা হয়েছিল 'আর ফাতহুল কাবীর ফী যম্মিয যিয়াদাতি ইলাল জামিয়িস সগীর' এই কিতাবকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। সেটি হলো 'সহীহুল জামে' আর 'যঈফুল জামে'। এর হাদীসের সংখ্যা ৬৪৬৯, এর মধ্যে মাওযূ হাদীস হলো প্রায় ৯৮০টি। আর

আলহামদুলিল্লাহ এই কিতাবটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মতোই প্রকাশিত হয়েছে।

القاعدة التاسعة سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

নবম কায়েদা: ‘আত তারগীব’ কিতাবে ইমাম মুনযিরী (রহি) এর কোন হাদীস ব্যাপারে নীরব থাকাটাই সেই হাদীসকে শক্তিশালী বলা উদ্দেশ্য নয়।

আসল হলো, যঈফ হাদীসের অবস্থা বর্ণনা করা ছাড়া সেই হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নয়, যেমনটি বর্ণনা সামনেই আসছে। এজন্য কোন কোন আলেম মনে করেছেন যে, ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ কিতাবে ইমাম মুনযিরী (রহি) যেই হাদীসের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, সেটিই প্রমাণ করে যে, তার নিকটে সেই হাদীস যঈফ নয়। আর অনেক হাদীসের ক্ষেত্রে এই দিকেই ধাবিত হয়েছেন শাইখ সায়্যিদ সাবিক (রহি)। অথচ এটি ইমাম মুনযিরী (রহি) এর পরিভাষা থেকে অমনোযোগিতারই বহিঃপ্রকাশ, যেই পরিভাষা তিনি তার কিতাবের ভূমিকাতেই স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি (রহি) সেই কিতাবের ৪ পৃষ্ঠাতে বলেন, যখন কোন হাদীসের সানাদ সহীহ অথবা হাসান অথবা এর কাছাকাছি পর্যায়ের হয়েছে তখন আমি সেই হাদীস عن শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছি। আর যখন কোন হাদীস মুরসাল[১২] অথবা মুনকাতেঈ[১৩] অথবা মু‘যাল[১৪] হয়েছে অথবা সেই সানাদে একজন মুবহাম বা অস্পষ্ট রাবী থাকে অথবা যঈফ অথবা কম বিশ্বস্ত রাবী থাকে এবং সানাদের অন্য রাবীগুলো বিশ্বস্ত হয় অথবা সেই রাবীগুলোর সম্পর্কে এমন কথা থাকে যাতে কোন ক্ষতি নেই অথবা যখন সেই হাদীসকে মারফূভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সহীহ হলো সেটি মাওকূফ অথবা মুত্তাছিলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সহীহ হলো সেটি মুরসাল অথবা সেই সানাদ যঈফ, কিন্তু যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

---

[১২] যে হাদীসের সানাদের শেষের দিক থেকে রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেই হাদীসকে মুরসাল হাদীস বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোন তাবেঈ সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে কোন হাদীস বর্ণনা করলে সেই হাদীসকে মুরসাল হাদীস বলে।

[১৩] যে হাদীসের সানাদে একজন রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায় তাকে মুনকাতেঈ হাদীস বলে।

[১৪] যে হাদীসের সানাদে পরস্পর একাধিক রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায় তাকে মু‘যাল হাদীস বলে।

তাদের কেউ কেউ এটিকে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন, তখনও আমি عن শব্দ দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। তারপর সেই হাদীসের মুরসাল হওয়া অথবা মুনকাতেঈ হওয়া অথবা মু‘যাল হওয়ার অথবা সেই মতভেদপূর্ণ রাবীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন আমি বলেছি, অমুকের বর্ণনা থেকে অথবা অমুকের সূত্র থেকে অমুক বর্ণনা করেছে অথবা এই সানাদে অমুক রাবী রয়েছে ইত্যাদি।

আর যখন সানাদে এমন কোন রাবী থাকে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে মাওযূ হাদীস বর্ণনাকারী অথবা মিথ্যুক অথবা মুত্তাহাম বা অভিযুক্ত অথবা হাদীস ভুলে গেছে অথবা (বর্ণনা করাতে) ভুলকারী অথবা তার কোন ভিত্তিই নেই অথবা সে খুবই যঈফ অথবা শুধু যঈফ অথবা যাকে আমি বিশ্বস্ত মনে করিনি, যার ফলে তার হাদীস হাসান পর্যায়ে পৌছার কোন সম্ভাবনা নেই সেই হাদীস روي শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছি। আর পরে সেই রাবী এবং তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেগুলোর কোন কিছুই বর্ণনা করিনি। ফলে এই সানাদ যঈফ হওয়ার দুটি প্রমাণ। তাহলো, روي শব্দ দিয়ে এটি বর্ণনা করা এবং শেষে তার সম্পর্কে কোন কথা না বলা।

ইমাম মুনযিরী (রহি) এর এই কথা এবং এই কথাতে যে সংক্ষিপ্ত দিক, অস্পষ্টতা এবং অভিযুক্ত দিক রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘ছহীহুত তারগীব’ এই কিতাবের ভূমিকাতে। সুতরাং সেখান থেকে পড়ে নাও। কেননা এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

القاعدة العاشرة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

দশম কায়েদা: অনেক সূত্রের মাধ্যমে হাদীস শক্তিশালী হয়, এটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়।

আলেমগণেল নিকটে প্রসিদ্ধ যে, কোন হাদীস যখন অনেকগুলো সূত্র থেকে আসবে, তখন এর মাধ্যমে সেটি শক্তিশালী হয় এবং সেটি দিয়ে দলীল পেশ করার উপযুক্ত হয়, যদিও প্রতিটি সূত্রই পৃথকভাবে যঈফ হয়। কিন্তু এটি সবক্ষেত্রে সঠিক নয়। বরং মহাক্কীক আলেমগণের নিকটে এটি শর্তযুক্ত। সেই শর্ত হলো, যখন বিভিন্ন সূত্রের রাবীদের দুর্বলতা হবে তাদের খারপ স্মৃতিশক্তির কারণে, তাদের সত্যবাদিতা ও দীনদারিতার ব্যাপারে অভিযোগ থাকার কারণে নয়। এই শর্ত পূরণ না হলে, হাদীসের সূত্র যত বেশিই হোক

না কেন, তার দ্বারা সেটি শক্তিশালী হবে না। মুহাক্কিক আল মানাবী (রহি) তার কিতাব 'ফাইযুল কাদীর' এ এটি আলেমগণের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলেমগণ বলেছেন, যখন দুর্বলতা অনেক বেশি হবে, তখন সেটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হলেও সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবে না, যদিও সেই সূত্রগুলো অনেক বেশি হয়। সেজন্যই অনেক সূত্র থাকার পরেও 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে' এই হাদীসটি যঈফ হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ একমত হয়েছেন। কেননা এতে অনেক বেশি দুর্বলতা রয়েছে, যেই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যেই হাদীসের দুর্বলতা কম হবে এবং যেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব, সেই হাদীসটির দুর্বলতা দূর হবে এবং সেটি শক্তিশালী হবে।

এই বিষয়ে 'কাওয়াইদুত তাহদীস' (৯০ পৃ.) এবং 'শারহুন নুখবাহ' (২৫ পৃ.) এই দুটি কিতাব পড়ো। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি অনেকগুলো সূত্র দিয়ে কোন হাদীসকে শক্তিশালী করতে চায়, সে যেন সকল সূত্রের রাবীদের সম্পর্কে অবহিত হয়, যাতে করে তার সামনে সেই হাদীসের দুর্বলতার স্তর স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলো, খুব কমসংখ্যক আলেমই এমনটি করে, বিশেষ করে পরবর্তীদের মধ্যে থেকে। তারা সেই হাদীস সম্পর্কে অবহিত না হয়েই এবং সেটি কতখানি যঈফ সেটি না জেনেই 'এই হাদীসের অনেন সূত্র রয়েছে' এটি অন্যদের নিকট থেকে বর্ণনা করেই হাদীসকে শক্তিশালী বলে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যে ব্যক্তি তা তালাশ করবে, সে তাখরীজ সম্পর্কীত কিতাবগুলো তা পাবে, বিশেষভাবে আমার কিতাব 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ' এই কিতাবে।

القاعدة الحادية عشرة لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

একাদশ কায়েদাঃ যঈফ হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করা ছাড়া সেটি বর্ণনা করা জায়িয নয়।

অনেক লেখকগণ বিশেষ করে বর্তমান সময়ের অনেক লেখকগণই যঈফ হাদীসের দুর্বলতা না জানিয়েই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করে। এটি তারা করে মুর্খতাবশত অথবা যঈফ হাদীসের ওপর আগ্রহবশত অথবা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা থেকে অলসতাবশত। আর কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম

বিশেষভাবে ‘ফাযায়েলে আমাল’ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিষয়ে শিথীলতা করেছেন।

আবূ শামাহ বলেন, মুহাক্কীক মুহাদ্দীস, উসূবিদ এবং ফকীহ আলেমগণেল নিকটে এটি (যঈফ হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা না করেই সেটি বর্ণনা করা) ভুল। বরং যদি দুর্বলতা সম্পর্কে জানে তাহলে তা বর্ণনা করে দিবে। আর নইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানীতে বর্ণিত হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন হাদীস বর্ণনা করে যেটিকে সে মিথ্যা মনে করে, তাহলে সে মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এই বিধান হলো যে ব্যক্তি ফযীলত সম্পর্কীত যঈফ হাদীসের বিষয়ে নীরব থাকে। তাহলে যে ব্যক্তি আহকাম বা বিধি বিধানসহ অনুরূপ বিষযে নীরব থাকে তার অবস্থা কেমন হবে? জেনে রেখো, যে ব্যক্তি এমনটি করবে যে দুই শ্রেণির এক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. হয় সে এই হাদীসগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে জানে, কিন্তু সেগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে জানায় না। সে হলো মুসলিমগণের সাথে প্রতারণাকারী এবং সে অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত হুমকির অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান (রহি) তার ‘আয যুআফাহ’ (১/৭-৮) কিতাবে বলেন, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কোন মুহাদ্দীস যখন এমন হাদীস বর্ণনা করবে যেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত নয়, বরং তার ওপর সেটি মিথ্যারোপ করা, অথচ সেটি সে জানে, তাহলে সে মিথ্যাবীদের একজন। যদিও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ এর চেয়ে আরো কঠিন। তাহলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন হাদীস বর্ণনা করে যেটিকে সে মিথ্যা মনে করে’, তিনি বলেননি যে, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেটি মিথ্যা, (বরং সে শুধু মিথ্যা হওয়ার বিষয়ে ধারনা করে)। সুতরাং কোন বর্ণিত হাদীস সহীহ না সহীহ নয় এমনটি সন্দেহকারী প্রতিটি ব্যক্তিই এই হাদীসের বাহ্যিক সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু আব্দিল হাদী (রহি) ‘আস সরিমুল মানকী’ (১৬৫ পৃ.) কিতাবে এমনটিই বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সেটিকে সমর্থন করেছেন।

২. অথবা সে সেই হাদীসের দুর্বলতা সম্পর্কে জানে না। সেও পাপী। কেননা সে ইলম ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সেই হাদীসকে সম্পৃক্ত করার দিকে ধাবিত হয়েছে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা

শুনে তাই বর্ণনা করে।[১৫] এমন ব্যক্তির জন্যও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করার গুণার একটি অংশ থাকবে। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি যা শুনবে সেটিই যদি বর্ণনা করে, অনুরূপভাবে সেটিই যদি লিখে, তাহলে সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এর কারণে সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রথম ব্যক্তি হলো, সে মিথ্যারোপ করে আর অপর ব্যক্তি হলো সে মিথ্যা ছড়িয়ে দেয়। ইবনু হিব্বান (রহি) 'আয যুআফাহ' (১/৯) কিতাবে বলেন, হাদীসের সঠিকতা নিশ্চিতভাবে জানার আগে যা শুনবে সেটিই বর্ণনা করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে এই হাদীসে।

ইমাম নববী (রহি) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন হাদীসের দুর্বলতা সম্পর্কে না জানে, আর যদি সে আলেম হয়, তাহলে অনুসন্ধান করা ছাড়া সেটি দিয়ে দলীল পেশ করা তার জন্য হালাল হবে না। আর যদি সে আলেম না হয়, তাহলে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া সেটি দিয়ে দলীল পেশ করা তার জন্যও হালাল হবে না। আর এই বিষয়ে 'আত তামহীদ' (১০-১২ পৃ.) কিতাবটি পড়ো।

القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

দ্বাদশ কায়েদা: 'ফাযায়েলে আমল' সম্পর্কে বর্ণিত যঈফ হাদীসের ওপর আমল পরিত্যাগ করা।

অনেক আলেম ও ছাত্রদের মাঝে এটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়িয।

আর তারা মনে করে যে, এই বিষয়ে কোন মতেভদ নেই। কেন এমনটি মনে করবে না? কারণ ইমাম নববী (রহি) তার একাধিক কিতাবে এই বিষয়ে ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন! আর তিনি যেটি বর্ণনা করেছেন তাতে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। কেননা এই বিষয়ের মতভেদ সুপরিচিত। কিছু কিছু মুহাক্কীক আলেমগণের মতে, কোন অবস্থাতেই যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না, আহকাম বা বিধি বিধানের ক্ষেত্রেও না, আবার ফযীলতের ক্ষেত্রেও না। শাইখ আল কাসিমী (রহি) 'কাওয়াইদুত তাহদীস' (৯৪ পৃ.) কিতাবে বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রহি) থেকে ইবনু সায়্যিদিন নাস 'উয়ুনুল আসার'

[১৫] সহীহ মুসলিম, হা/৫, সিলসিলা সহীহাহ, হা/২০৫।

কিতাবে এমনটি বর্ণনা (যে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না) করেছেন, আর তিনি এটিকে সম্বন্ধ করেছেন আবূ বকর ইবনুল আরাবীর কিতাব 'মাতহুল মুগীছ' এই কিতাবের দিকে। আর এটিই স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহি) এর মাযহাবও এমনটিই ছিল, আর এটি ইবনু হাযম (রহি) এরও মাযহাব।

আমি (আলবানী) বলছি, এটিই হলো সঠিক, যেই বিষয়ে আমার কাছে কোন সন্দেহ নেই। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. যঈফ হাদীস এমন ধারণা দেয় যেটি প্রাধান্যযোগ্য নয়। আর সকলের ঐকমত্যে এমন ধারনার ওপর আমল করা জায়িয নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ফাযাইলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করাকে এই বিধান থেকে বের করবে, তাকে অবশ্যই দলীল দিতে হবে। কিন্তু হায়! (সেই দলীল কোথায়)?

২. আমি তাদের কথা 'ফাযাইলে আমল' এটি দিয়ে বুঝি যে, সেগুলো এমন আমল, যেগুলো হুজ্জত কায়েম হয় এমন দলীল দ্বারা সেই আমলগুলোর শরীআতসম্মত হওয়াটা প্রমাণিত। (অর্থাৎ সেই আমলটি করা যে শরীআতসম্মত তা সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত)। তার সাথে এমন যঈফ হাদীস রয়েছে যেই হাদীসে সেই আমলকারীর জন্য খাছ প্রতিদানের কথা বলা আছে। ফাযাইলে আমলের ক্ষেত্রে এমন হাদীসের ওপর আমল করা যায়। কেননা এর মাধ্যমে আমলটিকে সেই যঈফ হাদীসের মাধ্যমে শরীআতসম্মত করা হয় না। বরং এর মাধ্যমে শুধু বিশেষ প্রতিদানের কথা বর্ণনা করা হয়, যেই প্রতিদান আমলকারী পাবে বলে আশা করা যায়। কিছু কিছু আলেম পূর্বে বর্ণিত কথা (ফাযাইলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল) দিয়ে এমন অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন শাইখ আলী আল কারী (রহি) 'আল মিরকাহ' (২/৩৮১) কিতাবে বলেন, 'এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে, যদিও তা শক্তিশালী না হয়, যেমনটি ইমাম নববী (রহি) বলেছেন' এই কথা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো এমন ফযীলত যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এর ওপর ভিত্তি করেই বলা যায়, যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়িয হবে, যদি সেই আমলটির শরীআতসম্মত হওয়াটা প্রমাণিত হয়, যেই আমলের পক্ষে এই যঈফ হাদীস ছাড়াও এমন দলীল রয়েছে যা দিয়ে দলীল কায়েম হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এই মত যারা দেন তাদের অধিকাংশরাই এই অর্থ উদ্দেশ্য করে না। কেননা আমরা তাদেরকে যঈফ হাদীসের ভিত্তিতে এমন আমল করতে দেখি, যেই আমল এই যঈফ হাদীস ছাড়া অন্য কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যেমন ইমাম নববী (রহি) ইকামাতের দুটি বাক্যে (অর্থাৎ ক্বদক্বমাতিস

সালাহ, ক্বদক্বমাতিস সালাহ) ইকামাতদাতার জবাবে ‘আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা’ বলাকে মুস্তাহাব বলেন। আর লেখক (ফিকহুস সুন্নাহর লেখক) তারই অনুসরণ করেছেন। অথচ এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ, যেই বর্ণনা সামনেই আসছে। আর এই যঈফ হাদীস ছাড়া অন্য কোন সহীহ হাদীস দ্বারা এই আমলের শরীআতসম্মত হওয়াটা প্রমাণিত নয়। তারপরেও তারা এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন। অথচ মুস্তাহাব হলো শরীআতের পাঁচটি বিধানের একটি, যেটি প্রমাণ করতে অবশ্যই এমন দলীল লাগবে যা দিয়ে দলীল কায়েম হয়। এখানে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে তারা মানুষদের জন্য শরীআতসম্মত করেছে এবং মুস্তাহাব বলেছে। অথচ তারা শুধু যঈফ হাদীসগুলোর ভিত্তিতেই শরীআতসম্মত করেছে, যার পক্ষে সহীহ সুন্নাহতে বর্ণিত আমল থেকে কোন ভিত্তি নেই। এখানে এই বিষয়ে আর বেশি উদাহরণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এই উদারণগুলোর মধ্যে যেটি বর্ণনা করলাম সেটিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এই কিতাবে অনেক উদাহরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই যথাস্থানে এই সম্পর্কে সতর্কীকরণ আসবে।

সুতরাং এখানে বিপরীত মতাবলম্বীদের জেনে রাখা জরুরী যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা মতটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হাফিয ইবনু হাজার (রহি) ‘তাবইনুল উজব’ (৩-৪ পৃ.) কিতাবে বলেছেন, এটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, আলেমগণ ফযীলত সম্পর্কীত হাদীসগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথীলতা করেছেন, যদিও সেই হাদীসগুলোতে দুর্বলতা থাকে, যতক্ষণ সেই হাদীস মাওযূ না হয়। এর সাথে আরো একটি শর্ত যুক্ত করা উচিত। তাহলো, যঈফ হাদীসের ওপর আমলকারী যেন বিশ্বাস করে যে, এই হাদীসটি যঈফ। আর এটি যেন প্রসিদ্ধ না হয়ে যায়। যাতে মানুষ যঈফ হাদীসের ওপর আমল করে এমন বিষয় শরীআতসম্মত না করে যেটি আসলে শরীআতসম্মত নয় অথবা কিছু জাহিল দেখে সেটিকেই যেন সহীহ সুন্নাত মনে না করে। আর উস্তাদ আবূ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিস সালাম (রহি) সহ অন্যান্যরা এটিই স্পষ্টভাবে বলেছেন। আর মানুষ যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকে, যেখানে তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন হাদীস বর্ণনা করে যেটিকে সে মিথ্যা মনে করে, তাহলে সে মিথ্যাবাদীদের একজন। (শুধু এমন হাদীস বর্ণনা করলেই যদি এমন অবস্থা হয়) তাহলে যে ব্যক্তি এই হাদীস অনুযায়ী আমল করবে তার অবস্থা কেমন হবে? আর হাদীস অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে আহকাম বা বিধি বিধান এবং ফাযাইল এই দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা সবই হলো শরীআত।

সুতরাং যঈফ হাদীসের ওপর আমল জায়িয হওয়ার জন্য এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে।

১. সেটি যেন মাওযূ না হয়।

২. আমলকারী যেন জানে যে, সেটি যঈফ।

৩. সেই হাদীসের ওপর আমল যেন প্রসিদ্ধ হয়ে না যায়।

দুঃখজনক হলো, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আমরা অনেক আলেমকে দেখি যে, তারা এই শর্তগুলোর ব্যাপারে শিথীলতা প্রদর্শন করে। যার ফলে তারা কোন হাদীসের সহীহ যঈফ না জেনেই তার ওপর আমল করে। আর যদি তারা সেই হাদীসের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেও, তবুও তারা তার পরিমাণ জানে না যে, সেটি কম দুর্বল নাকি খুব বেশি দুর্বল যা আমলযোগ্য নয়। তারপর তারা এটি দিয়ে আমল করাকে প্রসিদ্ধ করে তোলে, যেমনটি সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে হয়। এজন্য মুসলিমদের মাছে এমন অনেক ইবাদত রয়েছে যা সহীহ নয়। এর ফলে এটি তাদেরকে এমন সহীহ ইবাদগুলো থেকে বিরত রেখেছে, যেগুলো বিশুদ্ধ সানাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

জমহুর আলেম আমরা যেই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছি সেই অর্থটি উদ্দেশ্য করে না। কিন্তু এই শর্তগুলো আমরা যেই মতের দিকে গিয়েছি সেটিকেই প্রাধান্য দেয়। কেননা এখানে কোন শর্ত লাগানোর প্রয়োজন পড়ে না, যেটি সুস্পষ্ট।

আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে, হাফিয ইবনু হাজার (রহি) যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়িয না হওয়ার দিকেই ঝুকেছেন। কেননা পূর্বে বর্ণিত তার কথাটি হলো, 'আর হাদীস অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে আহকাম বা বিধি বিধান এবং ফাযাইল এই দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা সবই হলো শরীআত'।

আর এটিই সঠিক। কেননা যঈফ হাদীসকে শক্তিশালী করবে এমন কিছু নেই। আর এটি মিথ্যা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি মিথ্যা, মাওযূ। আর কিছু আলেম এটি দৃঢ়ভাবে বলেছেন। আর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে তিনি বলেছেন, (কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন হাদীস বর্ণনা করে) 'যেটিকে সে মিথ্যা মনে করে' অর্থাৎ তার কাছে এমনটিই প্রকাশিত হয়। এজন্যই হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এই কথার পরেই বললেন, তাহলে এই হাদীস অনুযায়ী আমলকারীর অবস্থা কেমন হতে পারে? একাদশ কায়েদাতে ইবনু হিব্বান (রহি) থেকে বর্ণিত কথাটি এটিকে আরো জোরদার করে। সেটি হলো, 'সুতরাং কোন বর্ণিত

হাদীস সহীহ নাকি সহীহ নয় এমনটি সন্দেহকারী প্রতিটি ব্যক্তিই এই হাদীসের বাহ্যিক সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত'। আর হাফিয ইবনু হাজার (রহি) যেমনটি বলেছেন আমরাও তাই বলছি যে, তাহলে এই হাদীস অনুযায়ী আমলকারীর অবস্থা কেমন হতে পারে?

পূর্বে বর্ণিত কথাটিই হাফিয (রহি) এর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে (সেটি হলো, তার মতে কোনক্ষেত্রেই যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না)। পক্ষান্তরে যারা বলে যে, এই কথা দিয়ে তিনি মাওযূ হাদীসকে উদ্দেশ্য করেছেন, আর বিধি বিধান এবং ফযীলত সকল ক্ষেত্রেই মাওযূ হাদীসের বিধান সমান (সেটি হলো কোন ক্ষেত্রেই মাওযূ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না), যেমনটি বলে থাকে বর্তমান সময়ের কিছু শাইখরা, তাদের এই কথা হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এর আলোচনার প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে। কেননা তার আলোচনার প্রসঙ্গ ছিলো যঈফ হাদীস, মাওযূ হাদীস নয় যেটি সুস্পষ্ট।

আর আমরা বর্ণনা করলাম যে, হাফিয ইবনু হাজার (রহি) যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার জন্য কিছু শর্ত বর্ণনা করলেন। এটির মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই, যেমনটি অনেক শাইখ মনে করে থাকেন। কেননা আমরা বলি যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যারা যঈফ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথীলতা প্রদর্শন করে, যতক্ষণ সেটি মাওযূ না হয়, তাদেরকে লক্ষ্য করে হাফিয (রহি) বলেন, যখন তোমরা এমনটিই মনে কর, তাহলে এর সাথে এই শর্তগুলোকে যুক্ত করতে হবে, যেমনটি আমি এই কায়েদাতে করেছি। হাফিয (রহি) স্পষ্টভাবে বলেননি যে, তিনি এই শর্তগুলো সাপেক্ষে যঈফ হাদীসের ওপর আলম করার বিষয়ে তাদের সাথে আছেন। বিশেষ করে তার শেষের কথাতে এটি বুঝা যায় যে,তিনি এর বিপরীতে আছেন, যেমনটি আমরা স্পষ্ট করেছি।

এই আলোচনার সারকথা হলো, ফাযাইলে আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার মতটি সঠিক নয়। কেননা এটি আসল বা মূলের বিপরীত এবং এর পক্ষে কোন দলীল নেই। আর যে ব্যক্তি এই মত (যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়িয হওয়ার মত) দিবে, তাকে অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত শর্তগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আমলের ক্ষেত্রে সেগুলোকে অবশ্যই পালন করতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলাই হলেই তাওফীকদাতা।

তারপর আমরা যেটিকে প্রাধান্য দিয়েছি তার বিপরীত মতের (যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার) খারাপ দিক হলো, এটি এই মতাবলাম্বীদেরকে ফযীলতের গণ্ডি থেকে শারঈ বিধি বিধান, এমনকি আকীদার গণ্ডিতেও নিয়ে যায়। (অর্থাৎ

তখন তারা বিধি বিধান এবং আকীদার ক্ষেত্রেও যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা শুরু করে)। আমার কাছে এই ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু আমি শুধু একটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

একটি হাদীস আছে যেটি, সালাতে সুতরা না থাকলে মুসল্লীর সামনে রেখার টানার আদেশ করে। ইমাম বাইহাকী এবং ইমাম নববী (রহি) তারা উভয়েই স্পষ্টভাবে হাদীসটিকে যঈফ বলার পরেও এর ওপর আমল করাকে জায়িয বলেছেন। কিন্তু তাদের ইমাম শাফেঈ (রহি) এর বিপরীত। আর অচিরেই ইমাম বাইহাকী এবং ইমাম নববী (রহি) এদের কথার আলোচনা বর্ণিত এই হাদীসের আলোচনার সময়ে আসবে।

যে ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা চায়, সে যেন ‘সহীহুত তারগীব’ (১/১৬-৩৬) এই কিতাবের ভূমিকা পড়ে নেয়।

القاعدة الثالثة عشرة لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

ত্রয়োদশ কায়েদা: যঈফ হাদীসের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে ইত্যাদি।

ইমাম নববী (রহি) ‘আল মাজমু শারহুল মুহাযযাব’ (১/৬৩) কিতাবে বলেন, মুহাক্কীক মুহাদ্দীসগণসহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, যখন কোন হাদীস যঈফ হবে, তখন তার সম্পর্কে বলা যাবে না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা করেছেন অথবা আদেশ করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন অথবা ফায়সালা দিয়েছেন ইত্যাদি। এই ধরনের নিশ্চয়তামূলক শব্দ দিয়ে বলা যাবে না। অনুরূপভাবে এমনটিও বলা যাবে না যে, আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেছেন অথবা বর্ণনা করেছেন ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তীদের সম্পর্কেও এমনটি বলা যাবে না, যদি সেই বর্ণনা যঈফ হয়। এসবগুলোর কোন বর্ণনাতেই নিশ্চয়তামূলক শব্দ দিয়ে বলা যাবে না। বরং এগুলোর সবগুলোতে বলতে হবে, তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় অথবা বলা হয় অথবা উল্লেখ করা হয় ইত্যাদি। এই ধরনের অনিশ্চয়তামূলক শব্দ দিয়ে বলতে হবে, নিশ্চয়তামূলক শব্দ দিয়ে নয়। আলেমগণ বলেন, এর কারণ হলো, নিশ্চয়তামূলক শব্দ সহীহ অথবা হাসান বর্ণনা জ্য প্রযোজ্য আর অনিশ্চয়তামূলক শব্দ অন্যগুলোর জন্য। কেননা নিশ্চয়তামূলক শব্দ (বর্ণনাটি)

যার দিকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে তার থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হওয়ার দাবি রাখে। যার ফলে যেটি সহীহ নয় সেটি ছাড়া অন্যের জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে না। নইলে সেই মানুষ (যার দিকে বর্ণনা করছে) তার সম্পর্কে মিথ্যারোকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। দক্ষ মুহাদ্দীসগণ ছাড়া লেখক (মহাযযাব কিতাবের লেখক আশ শীরাযী), আমাদের সাথীদের মধ্যে অধিকাংশ ফকীহসহ অন্যান্যরা এই আদব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অথচ এটি তাদের থেকে একটি খারাপ ধরনের শিথীলতা। তারা অনেক সহীহ বর্ণনাতে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, আর অনেক যঈফ বর্ণনাতে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা অমুক বর্না করেছেন। এটি হলো সঠিককে পরিত্যাগ করা।

আমি (আলবানী) বলছি, আমাদের লেখক (ফিকহুস সুন্নাহর লেখক) আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তিনিও অধিকাংশদের সাথে এই বিষয়ে সঠিককে পরিত্যাগ করেছেন, যেমনটি টীকা দেয়ার সাথে সাথে এই বর্ণনা সেই স্থানগুলোতে অচিরেই আসবে। কিন্তু ইমাম নববী (রহি) আলেমগণের থেকে যেটি বর্ণনা করলেন সেই বিষয়ে আমার একটি বিশেষ মত রয়েছে, যেটি এই স্থানে অবশ্যই ব্যক্ত করা প্রয়োজন। তাই আমি বলছি,

মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিত হলো, যথাসম্ভব এমনভাবে মানুষদেরকে সম্বোধন করা যা তারা বুঝে। আর পূর্বে বর্ণিত মুহাক্কীকদের থেকে যে পরিভাষা বর্ণনা করা হলো, সেটি অধিকাংশ মানুষই বুঝবে না। 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' আর 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে' এই দুটির মাঝে তারা পার্থক্য করতে পারবে না। কেননা তার সুন্নাহর জ্ঞানে কম নিয়োজিত। তাই আমি মনে করি যে, অবশ্যই হাদীসের বিশুদ্ধতা অথবা দুর্বলতা স্পষ্টভাবে বলতে হবে যাতে সংশয় দূর হয়ে যায়, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো।[১৬] হাদীসটি ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম তিরমিযী (রহি) বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এটি 'ইরওয়াউল গালীল' সহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

[১৬] তিরমিযী, হা/২৫২০, নাসাঈ, হা/৫৭১১, ইরওয়াউল গলীল, হা/২০৭৪।

চতুর্দশ কায়েদাঃ সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা ফরয, যদিও অন্য কেউ সেই অনুযায়ী আমল না করে।

ইমাম শাফিয়ী (রহি) তার বিখ্যাত কিতাব 'আর রিসালাহ' তে বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বুড়ো আঙ্গুলের দিয়াত নির্ধারণ করলেন পনেরটি উট। তারপর যখন তিনি আমর ইবনু হাযম (রা) এর পরিবারের নিকটে একটি পত্র পেলেন, যাতে লেখা ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি আঙ্গুলের দিয়াতই হলো দশটি উট, তখন তিনি সেটিই গ্রহণ করলেন। ইমাম শাফিয়ী (রহি) বলেন, যতক্ষণ প্রমাণিত না হলো যে, এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র, ততক্ষণ তারা সেটি গ্রহণ করেননি। এতে দুটি দলীল বিদ্যমান।

প্রথমটি হলো, সংবাদ গ্রহণ করা আর অন্যটি হলো, যখনই সংবাদটি প্রমাণিত হবে তখনই সেটি গ্রহণ করা, যদিও গ্রহণীয় সংবাদের ওপর কোন ইমামের আমল না থাকে। এটি আরো প্রমাণ করে যে, (কোন বিষয়ের ওপর) যদি কোন ইমামের কোন আমল থাকে, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সেই আমলের বিপরীত সংবাদ আসে, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদের সামনে সেই আমলকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস স্বয়ং নিজেই প্রমাণিত হয়, তার পরবর্তীতে অন্য কারো আমল দিয়ে নয়।[১৭]

القاعدة الخامسة عشرة أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

পঞ্চাদশ কায়েদাঃ কোন একজনের উদ্দেশ্যে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন আদেশ আসলে তা উম্মতের সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

হিকমতওয়ালা শরীআত প্রণেতা যখন উম্মতের কোন একজনকে সম্বোধন করেন অথবা যখন কারো জন্য কোন বিধান দেন, তাহলে সেটি খাছ হওয়ার দলীল দলীল প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত সেটি কি উম্মতের সকলের জন্যই আম হবে নাকি শুধু সেই সম্বোধনকৃত ব্যক্তির জন্যই খাছ হবে?

---

[১৭] আর রিসালাহ, ৪২২ পৃ.।

এই বিষয়ে উসূলবিদগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিক। আর এটিই ইমাম শাওকানী (রহি) সহ অন্যান্য মুহাক্কীক আলেমগণ প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৮] ইবনু হাযম (রহি) উসূলুল আহকাম' (৩/৮৮-৮৯) কিতাবে বলেন,

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার সময়ে জমীনে বসবাসকারী সকল মানুষ ও জিন থেকে শুরু করে তার পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের সকলের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে এবং যেই জিনিস সৃষ্টি করবেন সেগুলোর বিষয়ে তিনি বিধান দেন। সুতরাং যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই উম্মতের সকলের ইজমা এবং প্রমাণিত দলীল দ্বারা সহীহ সাব্যস্ত হলো যেটি আমরা বর্ণনা করেছি যে, এই দীন কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এবং মানুষ ও জীন এটিকে আঁকড়ে ধরবে, আর বিবেক দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যারা আসবে, তাদেরকে প্রত্যক্ষ করার তার কোন উপায় নেই, ফলে এতেই প্রমাণিত হয় যে, এই এক শ্রেণির (মানুষ অথবা জিন) কোন একজনকে উদ্দেশ্য করে তার আদেশ আসলে সকলেরই জন্য প্রযোজ্য। আর এই শরীয়তে শুধু একজনকে অথবা এক জনস্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করে যেই বিধান রয়েছে, সেটি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটি শুধু তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিধান। যেমন আবূ বুরদাহ ইবনু নিয়ার (রা) এর জাযাআ ছাগল সম্পর্কীত ঘটনা। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার পরে আর কারো জন্য জাযাআ ছাগল যবেহ করা যথেষ্ট হবে না। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসতাহাযা নারীর জন্য যে আদেশ করেছিলেন সেটি সকল মুস্তাহাযা নারীর জন্যই প্রযোজ্য। আর তিনি সালাতে ইবনু আব্বাস ও জাবির (রা) কে ডান পাশে দাঁড় করে দিয়েছিলেন। এই বিধান যারাই একাকী ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে সেই সকল মুসলিম পুরুষ ও নারী সকলের জন্য। এই বিষয়ে কারো মধ্যে কোন দ্বিমত নেই যে, উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ করে তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ কিয়ামত পর্যন্ত যারাই আসবে তাদের সকলের জন্য।

---

[১৮] শাইখ মুহাম্মাদ আল খাযরী এর 'উসূলুল ফিকহ' (২০৮-২০৯) বইটি পড়ো।

তারপর তিনি (ইবনু হাযম) যারা বিরোধিতা করে তাদের রদ্দ করা শুরু করেন। সুতরাং তুমি সেখান থেকে তা পড়ে নাও।

হাদীসের ও ফিকহের কায়েদাগুলোর মধ্যে যেগুলো বর্ণনা করা মাসলাহাতের দাবি এটি হলো সেই কায়েদাগুলোর সর্বশেষ কায়েদা। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ফিকহুস সুন্নাহর লেখক এগুলো মেনে চলেননি অথবা খুব কমই মেনে চলেছেন, যদিও আমার দেখা মতে, এই কিতাবের বিষয়বস্তুগুলো অনেক সুন্দরভাবে সাজানো। আর ইনশাআল্লাহ অচিরেই উপকারী টীকা প্রদানের সাথে সাথে যথাস্থানে এই সবগুলো বর্ণনা আসবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি , তিনি যেন সঠিক বিষয়কে আমাদের কাছে প্রিয় করে দেন এবং এগুলোর মাধ্যমে সকল অঞ্চলের মুসলিম ভাইদেরকে উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা এবং দুআ কবুলকারী।

ভূমিকা

রচনায়ঃ মুহাম্মাদ ঈদ আল আব্বাসী

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করছি। একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের নফসের যাবতীয় অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল অন্যায়মূলক কর্ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো। যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না" (আলে ইমরান ৩:১০২)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا﴾

"হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের ঐ মহান রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং সেই ব্যক্তি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এবং উভয়ের থেকে বহু নর-নারী সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো, যার নাম দিয়ে তোমরা পরস্পর একে অপরের অধিকার দাবি করে থাক। এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপরে সর্বদা তত্ত্বাবধায়করূপে আছেন" (আন নিসা ৪:১) । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٧١﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। এবং যথার্থ কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ সংশোধন করে দিবেন। তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, সে নিশ্চিত সফলতা লাভ করবে" (আল আহযাব ৩৩:৭০-৭১) ।

পর সমাচার মূল কথা হল:

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

সবচেয়ে সত্য ও সঠিক কথা হল আল্লাহর কিতাব। আল সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ হল মুহাম্মাদ – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল দীনের মাঝে সংযুক্ত নতুন নিয়ম। আর প্রত্যেকটা নতুন নিয়মই হল বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই হল পথভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

পরবর্তী কথা হল; যদিও আমাদের জাতির উপরে কুফর ও পথভ্রষ্টতার তরঙ্গ প্রবাহ তার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নেতৃত্ব করার চেষ্টা করছে। এবং তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশের অতল গহবরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। যদিও আধুনিক জাহেলী সভ্যতার অনুসারীরা তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করছে ও তাদের সকল সৈন্যদেরকে একত্রিত করে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম উম্মাহকে তার আকীদা

থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং দীনকে তার জীবনের শেকড় থেকে উৎপাটন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তথাপি এখানে সেথায় সামান্য আলোকবর্তিকা, অতি অল্প আশা অবশিষ্ট আছে, যা পরিসস্থিতির গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। যিনি উক্ত স্রোতের মাঝে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। যিনি সাঁতার কেটে নড়াচড়া করার চেষ্টা করেন। এবং কিনারার সন্ধান করতে থাকেন, যাতে করে উত্তেজিত ধ্বংসাত্মক সেই স্রোতকে প্রতিরোধ করে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়। এবং গোটা দেশ ও নাগরিকবৃন্দকে সেই স্রোতের পরিণাম ও বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়। উক্ত স্রোত আর কিছুই নয়। বরং সেটা হল এখানে সেখানে বিদ্যমান এই সিক্ত ফুলের কুঁড়িগুলো, এবং ফুটন্ত পুষ্পগুলো। অর্থাৎ মুসলিম মুমিন যুবক, যে নিজের দুই চক্ষুকে জীবনের সামনে মেলে ধরেছে। এবং কিছু বিপ্লবী ও সংস্কারপন্থি দাঈগণের আহবান শুনে চোখ খুলেছে। যারা তার মাঝে আত্মসম্মানবোধ ও উদ্দীপনামূলক চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। তার মাঝে দীনী আবেগ ও ঔদ্ধতপূর্ণ মানসিকতার সঞ্চারণ ঘটিয়েছে। আর সেই যুবকগণ উম্মাহকে দীর্ঘ নিদ্রার পরে জাগ্রত করার চেষ্টা করছে। যারা উম্মাহকে শত্রুদল ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ফলে তারা সেই লক্ষ্য পূরণে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছে। আর তারা অকুণ্ঠচিত্তে নির্ভীকরূপে অবিরাম সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু অতিসত্ত্বর তারা অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্য করে যে, তারা তাদের পূর্বের অবস্থানেই স্থায়ীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। এবং দীর্ঘ ভ্রমণ ও কঠোর ক্লান্তির পরেও তারা তাদের পথের ঠিক সেই স্থানেই এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে তারা পথ চলতে শুরু করেছিল। যেই পথকে তারা বহু আগেই পাঁড়ি দিয়েছিল। এই পরিণতির ফলে তারা আফসোস করে এবং চিন্তাগ্রস্থ হয়। তাদের কেউক কেউ হতাশ হয়ে আন্দোলনের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় নতুন করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করে আরেকটি দল সামনে অগ্রসর হয়। আর তারা একই অভিজ্ঞতা আবার অর্জন করে এবং একই কাজ করতে থাকে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তীদের চেয়ে কোনো অংশে উত্তম হয় না। পুর্বসূরীদের চেয়ে কোনো দিক থেকেই উৎকৃষ্ট হয় না। আর এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার হতে থাকে।

হ্যাঁ, এটাই বর্তমান যুগের আল্লাহর পথের সাধারণ দাঈগণের অবস্থা। দিশেহারা ও বিনাশ, হতবুদ্ধিতা ও অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা ও ত্বরিৎ প্রবণতা, যোগ্যতা ছাড়াই কর্ম সম্পাদন করা। যারা সঠিক পথ চিনে না। যারা দক্ষ পথ-প্রদর্শককে চিনতে পারে না। যে তাদেরকে তাদের অরাজকতা থেকে মুক্তি দান করবে। যে তাদেরকে তাদের গোলকধাঁধা থেকে বের করে আনবে। যারা

তাদের শ্রমকে কল্যাণময় পথে নিয়োগ করবে। আর তাদের কর্মসমূহকে সন্তোষজনক উপকারী লক্ষ্যে প্রয়োগ করবে। যে তাদেরকে চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে এবং কাংক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে।

আর সহীহ পথ একমাত্র কিতাব ও সুন্নাহর পথ। আর উভয়টিকে সেই মানহাজের আলোকে বুঝার চেষ্টা করা, যেই মানহাজের আলোকে আমাদের সালাফগণ – রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম – বুঝেছিলেন এবং উভয়টির উপরে আমল করা এবং উভয়টির দিকে মানুষকে আহবান করা। উভয়টির সিদ্ধান্তের উপরে অটল থাকা। আর বিচক্ষণ আদর্শবান আলেম হলেন তারাই, যারা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানে আলোকিত। উভয়টির নিয়মানুসারে আমলকারী। উভয়টির প্রতি নিষ্ঠাবান। উভয়টির আদর্শে আদর্শবান।

আর অনর্থকভাবে একজন মুসলিম যুবক ইসলামের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করে এবং এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অন্য পদ্ধতিতে মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করে। ইসলামী আন্দোলনগুলো ঐ সকল মহান মনীষাব্যক্তিত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সহযোগিতা কামনা না করে অযথাই কাংখিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে।

অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপরে মহা অনুগ্রহ প্রদর্শন করত – অশেষ গুণগান তাঁরই জন্য এবং তিনিই সকল করুণার আধার, যিনি বিরাট দয়া-অনুকম্পা এবং সকল নিআমতের অধিকারী – আমাদের জন্য একজন প্রকৃত আলেমকে তিনি প্রস্তুত করে দিয়েছেন, যিনি হেদায়েত প্রাপ্ত ইমাম ও সালাফে সালিহীন এর অবশিষ্টাংশ।

ফলে তিনি আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে সংগৃহিত বিশেষ ইলমের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে তার মাধ্যমে আমাদেরকে সেই হকের পথ দেখিয়েছেন, যা নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায় বাদানুবাদে লিপ্ত। এবং আমাদেরকে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রসূলের কালামের মাঝে বিক্ষিপ্ত মূল্যবান ধনভাণ্ডার ও উচ্চমূল্যের মুক্তামালার সন্ধান দিয়েছেন। ফলে আমরা দীর্ঘ ক্লান্তি ও পরিশ্রমের পরে শান্তি ও প্রশান্তির শীতলতা অনুভব করলাম। দীর্ঘ হতবুদ্ধিতা ও বিপথগামীতার পরে পূর্ণ তৃপ্তি ও সঠিক উপলব্ধি বোধ করলাম। ফলে আমরা সাধারণভাবে আমাদের উপরে গোটা জাতির এই অধিকার সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে মুসলিম যুবকদের এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলাম যে, আমাদের দায়িত্ব হল, আমরা তাদেরকে ঐ কল্যাণের পথ দেখাব, যা আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা অবগত

করেছেন। এবং তাদেরকে নিষ্ঠার ঐ পন্থা প্রদর্শন করব, যা বাস্তবায়নের তাওফীক মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন। যাতে করে আমরা তাদের হাত ধরে তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে যেতে পারি। আর তাদের সাথে মিলে একে অপরকে ধ্বংস ও বিপথগামীতার সকল কার্যকারণ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে সহযোগিতা করতে পারি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটেই সকল কর্ম বাস্তবায়নের চিরন্তন তাওফীক ও সামর্থ বিদ্যমান।

এই জন্যই আমরা এখন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের অর্জিত সর্ব প্রকার উপকারী জ্ঞান ও গভীর গবেষণালব্ধ প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা মুসলিমদের পাথেয় জোগান দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। যেই জ্ঞান-গবেষণা তাদের সামনে উপস্থিত করবে প্রকৃত ইসলামকে, যা হবে স্পষ্ট। যেখানে কোনো প্রকার দুর্বোধ্যতা থাকবে না। যা হবে অতি সহজ, যেখানে কোনো জটিলতা নেই। যা হবে পরিশুদ্ধ, যেখানে কোনো দাগ থাকবে না। যা হবে স্বচ্ছ ও নির্মল, যেখানে কোনো প্রকার আবর্জনা ও ময়লা থাকবে না। যেখানে মাসআলাগুলো দলীলসহ উল্লেখ থাকবে। সকল মতামত সংশ্লিষ্ট উৎসসহ উল্লেখ করা হবে। যা গবেষকদেরকে অসংখ্য বিরাটকায় গ্রন্থগুলো অধ্যায়নের ঝামেলা থেকে মুক্তি দিবে। যা তাদেরকে উজ্জ্বল প্রমাণ ও আলোকিত দলীলসমূহ দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে। যা তাদেরকে বিপথগামীতা ও বিনাশ, এবং মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করবে। এবং তাদের মাঝে একক মতাদর্শের জন্ম দিবে, যেই উৎস থেকে একক চেতনার জন্ম হবে। আর এই একক চেতনার জন্মের পরে – ইনশা আল্লাহু তা'আলা – সমগ্র বিশ্বে দীন প্রয়োগ, প্রচার-প্রসার ও সুদৃঢ়করণের স্বার্থে দীন প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হবে।

এই সকল পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনার পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল, মুসলিম দাঈদের জন্য একটি যথার্থ জ্ঞানগর্ভ আন্দোলনের সূচনা এবং এর একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি স্থাপন করা। আর এই জন্য আমরা এটাকে ইসলামী চিন্তাবিদও গবেষকগণের সমীপে এবং মুসলিম আলেম এবং মুমিন দাঈগণের সমীপে পেশ করছি। যাতে করে তারা এই বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মত পেশ করতে পারেন। এবং নিজ নিজ চেষ্টা সেখানে প্রয়োগ করতে পারেন। আর আমরা ভিত্তিগতভাবে প্রতিটি সমালোচনাকে সাধুবাদ জানাই। এবং সমালোচনাকারীর প্রতি আমাদেরক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর এটাকে আমরা আমাদের কার্যক্রমকে সফল করার পথে এবং আমাদের এই কার্যক্রমকে পরিপক্ক হওয়া ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে একটি কর্মমূলক সহযোগিতা

বলে মনে করব। কিন্তু আমরা মনে করি, প্রতিটি সমালোচনায় নিম্নেবর্ণিত তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখিতভাবে বা ঘোষণা আকারে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক:

১ – সমালোচনার মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য পূর্ণরূপে আন্তরিক হতে হবে। অর্থাৎ সমালোচনাকারীর উদ্দেশ্য যেন হয় হক পর্যন্ত পৌঁছানো এবং নছীহতের দায়িত্বটি যথাযথরূপে পালন করা।

২ – দীনের দুইটি মৌলিক ভিত্তি এবং প্রধান রুকন তথা কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে সহীহ জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকতে হবে।

৩ – সুমহান ইসলামী শিষ্টাচার বিদ্যমান থাকতে হবে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল ও অবজ্ঞাকরণ এবং হেয়করণ ও মুর্খ সাব্যস্তকরণ জাতীয় আচরণ থেকে মুক্ত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ পন্থায় সমালোচনা হতে হবে। তবে ঐ সকল বিরল ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং বাড়াবাড়ি করে। যারা দুর্ব্যবহার করে এবং বানোয়াট কথা বলে।

আর আজকে আমি এই পুস্তিকাটি আমাদের উস্তাদ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানীর নিকট "আল হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহি ফীল 'আক্বায়িদ ওয়াল আহকাম" শিরোনামে উপস্থাপন করব। এই আলোচনাটি তিনি মুসলিম ছাত্র ঐক্য পরিষদের অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেছিলেন। যা সংঘটিত হয়েছিল **১৯৭২** খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস অনুসারে **১৩৯২** হিজরীর রজব মাসে স্পেনের গ্রানাডা সিটিতে, যা বর্তমানে খ্রিস্টীয় স্পেন নামে পরিচিত। যা পূর্বে ইসলামী আন্দালুস নামে সুবিদিত ছিল।

যেই আলোচনা সভায় লেখক সুন্নাহর মর্যাদাগত অবস্থান ও দালীলীক গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলিমদের সঠিক মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এটাকে তিনি চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছিলেন।

প্রথম অনুচ্ছেদে ইসলামে সুন্নাহর অবস্থান, সুন্নাহর প্রতি মুসলিমদের ধাবিত হওয়া, সুন্নাহকে বিধানরূপে গ্রহণ করা এবং সুন্নাহর বিরোধিতার ক্ষেত্রে সতর্কীকরণ এর অপরিহার্য কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পরবর্তী যুগের আলেমগণের সুন্নাহর বিরোধিতা করার অপচেষ্টাগুলোর অসারতা এবং এই কার্যপদ্ধতির পক্ষে তাদের দাবিকৃত কিয়াস ও তাদের উদ্ভাবিত কিছু মৌলিক কায়দাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেগুলোর ভিত্তিতে তারা সুন্নাহকে দেয়ালের পিঠে নিক্ষেপ করেছেন।

আর তৃতীয় অনুচ্ছেদকে লেখক – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – ঐ সকল মূলনীতির অসারতার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো কালাম শাস্ত্রের কিছু প্রাচীন আলেম প্রণয়ন করেছেন। আর বর্তমান যুগের কিছু দাঈ ও আলেমগণ এটাকে প্রচার করেছেন। আর সেটা হল "আহাদ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হয় না" এমন দাবি করা। তিনি এই মূলনীতি প্রণয়নকারীদের ভুল স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু তারা এই মূলনীতির সাহায্যে আকীদা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মাঝে ও আহকাম সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মাঝে কোনো প্রকার সহীহ স্পষ্ট দলীল উপস্থাপন ব্যতীতই পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। বরং তারা এমনটি শুধুমাত্র মানসিক কল্পনা আর ধারণার বশবর্তী হয়েই এমনটি করেছেন।

যেই বিষয়টির প্রতি এখানে আলোকপাত করা দরকার, তা হল এই বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের উস্তাদ এখানে (এই গ্রন্থে) সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। যেহেতু তিনি এই বিষয়ে "আহাদ হাদীস ওয়াল আকীদা" শিরোনামে একটি বিশেষ রিসালাতে এই বিষয়ক বিস্তারিত দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, এবং উক্ত মতটির অসারতার পক্ষে উল্লেখযোগ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলীলসমূহের চূড়ান্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করে দেখিয়েছেন। এই আলোচনাটি তিনি আনুমানিক পনেরো বৎছর আগে দিমাশকে একদল সচেতন মুসলিম যুবকদের সভায় উপস্থাপন করেছিলেন। উক্ত মতের প্রচারের বিপক্ষে এবং সুশীল সমাজের মধ্যস্থলে এই মতের প্রচলনকারী ও প্রচারকারীদেরকে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই আলোচনাটি অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। যা "আকীদা বিষয়ে আহাদ পর্যায়ের হাদীসগুলো গ্রহণ করার আবশ্যকীয়তা" এই শিরোনামে (৫) ক্রমিক নম্বরে প্রচার করাকে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিয়েছেন।

এই রিসালার সর্বশেষ ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে লেখক এমন একটি ভয়ঙ্কর বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা মানুষের নিকট সুন্নাহর মান নষ্ট করা এবং সেই অনুসারে আমল করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর করে দেওয়ার কাজ চূড়ান্ত করেছে। আর সেটা হল তাকলীদ, যা কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম বিশ্বে জীবন ও চিন্তাদর্শনের সকল পরিধিকে গ্রাস করে ফেলেছে। বক্ষ দ্বারা প্রতিটি বিবেক ও মনন শক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে এটা চিন্তাশক্তির উদ্ভাবনী শক্তির মৃত্যু ঘটিয়েছে। সকল মনীষা ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করেছে। ঐশ্বরিক মেধাকে মাটিতে দাফন করে দিয়েছে। মানুষকে তাদের সুমাহান পবিত্র রবের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং মুহাম্মাদ – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর নিকট থেকে আগত কল্যাণ দ্বারা উকৃত হওয়ার

পথে তাদেরকে বাঁধা প্রদান করেছে। আর এগুলো সংঘটিত হয়েছে ঐ সকল আলেমের ইজতিহাদের অনুকরণের স্বার্থে, যারা নিজ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিবেচনা ছাড়া নিজ ছাত্রদের ব্যাপারে তাদের তাকলীদকে সমর্থন করেননি। বরং তাদের প্রত্যেকেই পরবর্তীদেরকে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর উপরে কারোর কোনো মত, মন্তব্য ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার নছীহত করেছেন। চাই যে কোনো ইমামই সেই মত অথবা সিদ্ধান্ত প্রদান করুকনা কেনো। ঠিক যেভাবে তারা আল্লাহর বক্তব্য ও তাঁর রসূলের বক্তব্যের বিরোধী সকল প্রকার মত, ইজতিহাদ ও ফতোয়া থেকে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এবং এমন মত ও সিদ্ধান্ত থেকে তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তন করার ঘোষণা দিয়েছেন।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের উস্তাদ মুসলিম যুবকদেরকে সম্বোধন করে তাদের নিকট পৌঁছেছে কিতাব ও সুন্নাহর এমন প্রতিটি বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ধাবিত হওয়ার আবেদন করেছেন। তাদের অন্তরে অনুকরণের মাত্রাকে বাস্তবায়নের স্বার্থে সম্ভাব্য ও সাধ্যানুসারে সুন্নাহর প্রতি আমল করতে উৎসাহিত করেছেন।

এর মাধ্যমেই কেবল তারা রসূল — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — কে একমাত্র অনুকরণীয়রূপে গ্রহণ করতে পারবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র নিজ সত্তাকে এককভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর ফলে তারা — শুধুমাত্র কথায় নয় — কর্মে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাক্ষ্য ও "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্যের মর্মকে বাস্তবায়ন করতে পারবে। এর মাধ্যমে তারা "শাসনক্ষমতার সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট" এই দাবি মৌখিকভাবে ঘোষণা এবং শ্লোগান দেওয়ার পরে নিজেদের মনে — শুধুমাত্র দাবির মাধ্যমে নয় বরং কর্মের মাধ্যমে —বাস্তবায়ন করতে পারবে। এবং এর মাধ্যমে তারা একমাত্র "কুরআন সমর্থিত বিরল প্রজন্ম" এর বিকাশ ঘটাতে পারবে। যারা আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

এই আলোচনাটি সুশীল মুসলিম ছাত্র সমাজের নিকট থেকে বিরাট প্রশংসা কুড়িয়েছে, যারা গভীরভাবে এটা শ্রবণ করেছে। যেহেতু তারা এর মাঝে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ সমীক্ষা এবং যথার্থ ন্যায্য মতামত দেখতে পেয়েছে। এবং লেখকের নিকট তারা উক্ত সমালোচনামূলক সমীক্ষাটির সংস্করণ ও প্রকাশনার দাবি জানিয়ে অনেকগুলো চিঠি পাঠিয়েছে। যাতে করে এর দ্বারা

প্রত্যেকটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নিষ্ঠাবান মুসলিম উপকৃত হতে পারে। যে সত্যকে অনুসন্ধান করে এবং সেটাকে আঁকড়ে ধরে।

এখানে আরেকটি বিষয়ের ব্যাপারে সকলকে অবহিত করা উত্তম মনে হয়, সেটা হল আমাদের মহান উস্তাদ সুন্নাহ সম্পর্কিত তৃতীয় আরেকটি বিষয়বস্তুর উপরে দুই বৎছর পূর্বে ক্বাত্বারে একদল মুসলিম যুবকের উপস্থিতিতে আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি সুন্নাতে নববী এর গুরুত্ব সম্পর্কে, ইসলামী শরীআতে এর অবস্থান এবং কুরআনের মর্মোদঘাটন ও তাফসীরের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অচিরেই নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে আলোচনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হবে।

এই হল বিষয়। আমরা আমাদের মহান উস্তাদের নিকট অসংখ্য ছাত্রদের দাবির প্রতিউত্তরে এই মূল্যবান আলোচনাটির সংস্করণ ও প্রকাশনের দাবি জানিয়েছি। ফলে তিনি – আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন – উক্ত বিষয়ে প্রশংসনীয়রূপে সম্মতি দিয়েছেন। ফলে আমরা পুস্তিকাটি তার নিকট মৌখিকভাবে পাঠ করেছি। এবং তার তত্ত্বাবধানে এটাকে আরো মার্জিত করেছি।

আলোচনার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরোনাম প্রণয়ন করেছি পাঠকের জন্য সহজ করে তুলতে এবং বিষয়বস্তুর মৌলিক উপাদানগুলো অনুধাবন করার ক্ষেত্রে পাঠককে সহযোগিতা করার স্বার্থে। আর এটা যেকোনো লেখনীর জন্য একটি আধুনিক বিন্যাস ও উৎকৃষ্ট মানের ক্রমধারা, যা উপকারী ও কল্যাণময়।[১৯]

আমি পুস্তিকাটির ভূমিকায় বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত কিছু আধুনিক পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা এবং সুন্দর বর্ণনা বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযুক্ত করে দেওয়া ভালো মনে করলাম। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি আশা করছি, তিনি যেনো এই পুস্তিকাটির দ্বারা অসংখ্য মানুষকে উপকৃত করেন এবং এর লেখক, প্রকাশক ও প্রচারককে সর্বোত্তম কল্যাণ দান করেন। একমাত্র সেই মহা পবিত্র সত্তার নিকটেই রয়েছে সকল কর্ম বাস্তবায়নের শক্তি ও যথাযথ সামর্থ। একমাত্র তিনিই সকল সাহায্য ও সহায়তার উৎস।

---

[১৯] পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এই পুস্তিকাটিকে "মানযিলাতুস সুইন্নাহ ফীল ইসলাম" শিরোনামে এই ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে ক্রমিক নম্বর (৪) এর অধীনে প্রকাশ করাকেও সহজ করে দিয়েছেন।

হাদীস সংক্রান্ত পরিভাষাসমূহ

সুন্নাহ, হাদীস, খবর ও আসারঃ

সুন্নাহঃ আভিধানিক অর্থে জীবন চলার এমন পথ ও পদ্ধতি, যা প্রচলিত ও পরিচিত। এই অর্থেই সুন্নাহ শব্দটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীতে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়"।[২০]

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

"তোমাদের জন্য আবশ্যক আমার ও আমার খলীফাগণের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা"।[২১]

পরিভাষায়ঃ সুন্নাহ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত এমন বাণী, কর্ম অথবা মৌন সম্মতি, যা দ্বারা উম্মাহর জন্য কোনো বিধান জারি করা উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত এমন দুনিয়াবী ও স্বভাবজাত বিষয়াদি সুন্নাহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে, যেগুলোর সঙ্গে দীনী বিষয়াদির কোনো সম্পর্ক নেই। যেগুলোর সঙ্গে অহীর কোনো সম্পর্ক নেই।

সাধারণ অর্থে **মুহাদ্দিসগণের মতে সুন্নাহঃ** সুন্নাহ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ওয়াজিব ও মুস্তাহাবকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ফক্বীগণের পরিভাষায় সুন্নাহঃ সুন্নাহ বলতে ওয়াজীব ব্যতীত কেবল মুস্তাহাব বিধানকে বুঝানো হয়।

হাদীসঃ আভিধানিক অর্থে এমন কথাকে বুঝানো হয়, যা আলোচনার উপযুক্ত, যা আওয়ায ও লিখনের দ্বারা বর্ণনা করা হয়।

পরিভাষায়ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে হাদীস হল সুন্নাহর সমার্থক। একদল আলেমের মতে, হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত বাণীর সাথেই নির্দিষ্ট। তাঁর কোনো কর্ম বা মৌন সম্মতি নই। প্রকৃতপক্ষে

---

[২০] বুখারী হা/৫০৬৩, মুসলিম হা/১৪০১

[২১] সহীহঃ ইবনে মাজাহ হা/৪২, আবূ দাউদ হা/৪৬০৭। মিশকাত হা/১৬৫।

আভিধানিক দিক থেকে সুন্নাহ এর মূল অর্থ হল: কর্ম ও মৌন সম্মতি। আর হাদীসের মূল অর্থ হল: কথা।

কিন্তু যেহেতু উভয়টির মূল উৎস হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তা, বিধায় অধিকাংশ মুহাদ্দিস শব্দ দুইটির আভিধানিক মৌলিক অর্থটি ভুলে উভয়টিকে একই পরিভাষায় সংযুক্ত করার পক্ষে এবং উভয়টি সমার্থক বলে মত দিয়েছেন। যেমনিভাবে তারা হাদীসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে একমাত্র এমন মারফূ এর সঙ্গে সুনির্দিষ্ট করার মত দিয়েছেন। তাই শব্দটিকে (তাদের মতানুসারে) অন্যদের থেকে প্রকাশিত কোনো কিছুর উপরে সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।

আর **খবর** হল: আভিধানিক অর্থে হাদীসের সমার্থক। সুতরাং উভয়টি একই বস্তু বুঝানো হয়। তবে অনেক আলেমের মাঝে হাদীসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংঘটিত হয়েছে এমন বস্তুর সঙ্গে নির্দিষ্টকরণ, আর খবরকে এর চেয়েও ব্যাপক অর্থে নির্ধারণের বিষয়টি প্রচলিত আছে। এই অর্থে যে, খবর হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং অন্যদের থেকে সংঘটিত বিষয়কে শামিল করে।

সুতরাং উভয়টির মাঝে 'উমূম-খুসূস এর সম্পর্ক। অর্থাৎ প্রত্যেকটি হাদীসই খবর, তবে প্রতিটি খবর হাদীস নয় (যেহেতু খবর হাদীসের চেয়েও ব্যাপক অর্থবোধক)। এই জন্য সুন্নাহ শাস্ত্রের গবেষককে মুহাদ্দিস বলা হয়। আর ইতিহাস ও যাবতীয় ঘটনাবলীর গবেষককে বলা হয়: আখবারী। আবার কোনো কোনো আলেম খবরকে হাদীস ও সুন্নাহ উভয়টির সমার্থক বলে মত দিয়েছেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক শ্রেষ্ঠ।

আসার হল: যা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই শব্দটিও খবরের ন্যায় মৌলিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংঘটিত ও অন্যদের থেকে সংঘটিত বিষয়কে ধারণ করে। আবার কেউ কেউ শব্দটিকে সালাফ তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন থেকে সংঘটিত বিষয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট বলে মত দিয়েছেন। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। কারণ, এর দ্বারা মাওকূফ হাদীসকে মারফূ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়।

সনদ ও মতন:

সুন্নাহ এর কিতাবগুলোতে বর্ণিত হাদীসে নববী দুইটি প্রধান অংশ দ্বারা গঠিত হয়; এক: সনদ, দুই: মতন।

সনদ অথবা ইসনাদ হলঃ এমন পথ, যা মতন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ ঐ সকল রাবী, যারা মতন স্থানান্তরিত করে সেটাকে পৌঁছে দিয়েছে। যা শুরু হয়েছে সর্বশেষ রাবী তথা সংশ্লিষ্ট হাদীস গ্রন্থের সংকলক থেকে। আর শেষ হয়েছে করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা।

মতন হলঃ হাদীসের এমন শব্দাবলী, যেগুলো অর্থবোধক। আলেমগণ সনদ বিহীন হাদীস গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এর কারণ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে মিথ্যার ছড়াছড়ির কারণে। বিখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন – রহিমাহুল্লাহ – বলেছেনঃ "তারা ইসনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ফিৎনা শুরু হল, তারা বললেনঃ আমাদেরকে তোমাদের রাবীগণের নাম বলো। আহলুস সুন্নাহ হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর আহলুল বিদআহ হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না"।[২২]

এরপরে আলেমগণ তাদের নিকটে স্থানান্তরিত হওয়া প্রতিটি সনদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। যদি সংশ্লিষ্ট সনদে সহীহ হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে, তবে তারা সেটা গ্রহণ করেন, অন্যথায় সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শর্তগুলো হলঃ সনদের রাবীগণের মাঝে যবত (হাদীস সংরক্ষণ), আদালাহ (ন্যায়পরায়ণতা) ও ইত্তিসাল (হাদীসের রাবীদের মাঝে কোনো বিচ্ছিন্নতা না থাকা) এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকা। আর হাদীসের মাঝে কোনো শুযূয (সনদ অথবা মতনের মাঝে ব্যতিক্রম) অথবা ইল্লাত না থাকা। এর ফলে "ইসনাদ দীনের অংশে রূপান্তরিত হল। যদি ইসনাদ না থাকত, তাহলে যার যা মন চাইত, সে তাই বলত"। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।[২৩]

আলেমগণ সনদ ও মতনের জন্য বিশেষ কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে উভয়টিকে গ্রহণ করা যায়। এই নীতিমালা একটি বিশেষ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, যার নাম 'ইলমু মুসত্বলাহুল হাদীস। যদি কারোর এই বিষয়ে আগ্রহ থাকে, তাহলে সে এই বিষয়ের কিছু গ্রন্থের স্মরণাপন্ন হতে পারে। যেগুলোর মাঝে অন্যতম সর্বোত্তম গ্রন্থ হল হাফেয ইবনু কাসীর – রহিমাহুল্লাহ – কৃত ইখতিসারু উলূমিল হাদীস। এই গ্রন্থের মিসরীয় মুদ্রণটি সবচেয়ে সুন্দর। যা শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকিরের তাহক্বীক্ব ও তালীকসহ ছাপানো হয়েছে।

---

[২২] মুক্বাদ্দিমাহ সহীহ মুসলিম (১/৮৪, ৮৭ শারহুন নববী) ।

[২৩] মুক্বাদ্দিমাহ সহীহ মুসলিম (১/৮৪, ৮৭ শারহুন নববী) ।

যেটার শিরোনাম হল “আল বাঈসুল হাসীস শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস” ।

আমাদের নিকট পৌঁছানোর বিবেচনায় সুন্নাহ দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে: মুতাওয়াতির, আহাদ। হানাফীগণ তৃতীয় আরেকটি প্রকার সংযোজন করেছেন, যার নাম মুস্তাফীদ্ব অথবা মাশহুর।

মুতাওয়াতির হল: আভিধানিক অর্থে: পর্যায়ক্রমে বিরতি দিয়ে একজনের পরে অপরজনের আগমন। যা বিতর মূল ধাতু থেকে গঠন করা হয়েছে। পরিভাষায়: মানবীয় স্বভাবের বিবেচনায় অথবা বিবেকের দৃষ্টিতে মিথ্যার উপরে সহমত পোষণ করা অসম্ভব – যা তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অথবা তাদের নির্ভরযোগ্যতার কারণেও হতে পারে – এমন একটি দলের পক্ষ থেকে কোনো অনুভবযোগ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান করা। অথবা এমন একটি দলের পক্ষ থেকে তাদের ন্যায় একটি দলের সংবাদ প্রদান করা, যা অনুবভযোগ্য বিষয় তথা চাক্ষুস দর্শন অথবা শ্রবণ জাতীয় বিষয় পর্যন্ত উপনীত হয়। আর মুতাওয়াতিরের মাঝে সংবাদ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শ্রবণ, তাঁর দর্শনযোগ্য কোনো কর্ম অথবা মৌনসম্মতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, এই ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির হাদীসের মাঝে **চারটি শর্ত পূর্ণ হওয়া জরূরী।**

এক: মুতাওয়াতির হাদীসের রাবীগণকে তাদের বর্ণনাকৃত হাদীসটি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান ও নিশ্চিত ধারণা থাকতে হবে। শুধুমাত্র অনুমান ও আন্দাজ নির্ভর হলে হবে না।

দুই: একটি অনুভবযোগ্য বিষয়ের প্রতি তাদের জ্ঞান নির্ভরশীল হতে হবে। যেমন, চাক্ষুস দর্শন অথবা শ্রবণ।

তিন: তাদের সংখ্যা এই পরিমাণ হওয়া, যাদের পক্ষে স্বভাবত মিথ্যার উপরে সহমত পোষণ করা অসম্ভব হয়। সহীহ মতানুসারে এই পরিমাণকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে বেধে দেওয়া যায় না। বরং এই পরিমাণ রাবীগণের বিশ্বস্ততা, তাদের হাদীস সংরক্ষণ করার সামর্থ ও সঠিকরূপে আয়ত্ত করার যোগ্যতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

চারঃ প্রত্যেক স্তরে রাবীদের সংখ্যা গ্রহণযোগ্য পরিমাণে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান থাকা। অর্থাৎ সনদের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে প্রতিটি ধাপে।[২৪]

আর তাওয়াতুর কখনো কখনো শব্দের ক্ষেত্রে হয়, আবার কখনো কখনো অর্থের ক্ষেত্রেও হয়। আর এই দুই প্রকারই সংশ্লিষ্ট সংবাদ সত্য ও সহীহ হওয়ার পক্ষে নিশ্চয়তা ও ইয়াকীনের বিবরণ দেয়। এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতানোইক্য নেই।

আর **আহাদ হাদীস** হলঃ পূর্বে বর্ণিত মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তগুলোকে একত্রে পূরণ করতে পারে না এমন প্রত্যেকটি হাদীস। কখনো হাদিসটিকে একজন রাবী বর্ণনা করে থাকেন, তখন হাদীসটির নাম হয় গরীব। আবার কখনো দুই বা ততোধিক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেন, তখন সেটাকে আযীয বলা হয়। আবার হাদীসটি যদি এতো বেশি পরিমাণে প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, একটি দল তা বর্ণনা করছে, তখন সেটা মাশহূর বা মুস্তাফীয হয়। এই নীতির ভিত্তিতে হাদীসটিকে আহাদ হাদীস বলা হলে তা সবসময় একজন ব্যক্তি থেকেই বর্ণিত হতে হবে বিষয়টি এমন নয়।

মাশহুর ও মুস্তাফীয হলঃ সহীহ মতানুসারে এটা আসলে আহাদ হাদীস এর একটি প্রকার মাত্র। হানাফীগণের মত এর বিপরীত, তারা এটাকে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকারে রূপ দিয়েছেন। আর এর উপরে ভিত্তি করে তারা নির্দিষ্ট কিছু বিধান প্রস্তুত করেছেন। তারা বলেছেনঃ এই প্রকারটি এমন মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে, যা সাধারণত খবরে ওয়াহিদ প্রদান করে না। আর এই নীতির আলোকে তারা এই মত প্রতিষ্ঠা করেছে যে, এই প্রকারটি মুতাওয়াতিরের ন্যায় কিতাবুল্লাহের সাধারণ মুতলাককে (সাধারণ অর্থে প্রয়োগকৃত) মুকাইয়াদ তথা নির্দিষ্ট সীমা বেধে দিতে পারে।[২৫]

সহীহ মত হল এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাবীদের সংখ্যা বিবেচনায় রাখতে হবে। আর মাশহুর ও ব্যাপক প্রসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে ঘটে থাকে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশের মতটিই সঠিক। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলো এটাকে কোনোভাবেই আহাদের বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক করতে পারে না। আর সকল শর্ত পূরণকারী মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে না। এটা শুরুতে ও শেষে আহাদ হাদীস বলেই বিবেচিত হবে।

---

[২৪] শাওকানী রচিত ইরশাদুল ফুহূল (পৃষ্ঠা ৪১ ও ৪২) সামান্য পরিবর্তনসহ।

[২৫] খিযরী রচিত উসূলুল ফকীহ (২১২ নং পৃষ্ঠা)।

চাই এর নাম ও উপাধিগুলো যতই পরিবর্তন হোক না কেনো। আর এই জন্যেই এর প্রতিটি প্রকার সহীহ, হাসান ও যঈফে বিভক্ত হয়ে থাকে।

সহীহ আহাদ হাদীস ইলম ও ইয়াকীনকে সাব্যস্ত করে কি না এই বিষয়ে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ যেমন ইমাম নববী (আত তাকরীব গ্রন্থে) বলেছেন, এটা (সংশয়পূর্ণ দুইটি বিষয়ের মাঝে) একটি বিষয়ের প্রাধান্যতাকে নিশ্চিত করে। অপরদিকে অন্য একদল আলেমের মত হল, শায়খাইন তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে যেসকল হাদীস সনদসহ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো ইলম ও অকাট্যতাকে সাব্যস্ত করে।

আর ইমাম ইবনু হাযম – রহিমাহুল্লাহ – আল ইহকাম গ্রন্থে (১/১১৯-১৩৭) এই মত পোষণ করেছেন যে, ন্যায়পরায়ণ একজন রাবীর তারই মানের অপর রাবীর সূত্রে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বর্ণনা ইলম ও আমল উভয়টিকেই ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

আমার মত ও বিশ্বাস অনুসারে সঠিক সিদ্ধান্ত হল উম্মাহ কোনো প্রকার অস্বীকৃতি অথবা সমালোচনা ব্যতীত গ্রহণ করেছে এমন প্রতিটি সহীহ আহাদ হাদীস ইলম ও নিশ্চিত বিশ্বাসকে সাব্যস্ত করে। চাই হাদীসটি সহীহাইনের কোনো একটিতে বিদ্যমান থাকুক অথবা অন্য কোনো গ্রন্থে থাকুক।[২৬]

সুন্নাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত যা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবেঃ

এটা এমন মাসআলা, যেই বিষয়ে আমি সতর্ক করতে চাই। এর গুরুত্ব ও অধিকাংশ মানুষ বিষয়টিত থেকে অসচেতন থাকার কারণে। মাসআলাটি হল সুন্নাহ যিকিরের একটি প্রকার। যা বিলুপ্ত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। অন্য যেকোনো বর্ণনার সঙ্গে মিশে যাওয়া থেকে সদা নিরাপদ থাকবে। সুন্নাহ এমনভাবে কখনো মিশ্রিত হবে না যে, সেটাকে অন্য (সুন্নাহ বহির্ভূত) বর্ণনা থেকে পৃথক করা যাবে না। পক্ষান্তরে কাদিয়ানী ও কুরআনপন্থি বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট কোনো কোনো দল এর চিন্তাধারা এর বিপরীত। তারা বলেঃ বানোয়াট মিথ্যা হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হাদীসের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, মানুষের পক্ষে এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

---

[২৬] আমি খতীব আল বাগদাদীকে দেখেছি তিনি এই মতটিকে তার রচিত আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ গ্রন্থে (৯৬ নং পৃষ্ঠা) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করেছেন।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পরে মুসলিমদের নিকট তাদের নবীর হাদীস অনিশ্চয়তার ধূম্রজালে মিশে গেছে এবং তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এরপরে তারা তা থেকে কোনো গবেষণা করতে পারেনি এবং সেই উৎসের দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করতেও সক্ষম হয়নি। কারণ, কোনো হাদীসের উপরেই তখন নির্ভর করা সম্ভব ছিল না।

এভাবেই তারা দীন ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান উৎসকে দেওয়ালের উপরে নিক্ষেপ করেছে। তারা এটাকে অবহেলা করেছে এবং বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অথচ এটাই হল সেই উৎস, যার উপরে প্রথম উৎসের (অর্থাৎ আল কুরআন) মর্ম অনুধাবন ও তা থেকে গবেষণামূলক তথ্য গ্রহণ নির্ভরশীল। আর এটাই তো ইসলামের শত্রুদল ও কাফেরদের একটি বড় লক্ষ্য ও প্রত্যাশা। এর জন্য তারা তাদের মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত।

তাদের অনেকে বলেছে: সহীহ হাদীস জাল হাদীসের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার পক্ষে বাস্তবতা নির্ভর প্রকৃত ঘটনা ঘটছে। তবে এমন ক্ষেত্রে কিছু হাদীসকে অন্যান্য হাদীসকে পৃথক করার পদ্ধতি আছে। আর সেটা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

“অচিরেই আমার ব্যাপারে মিথ্যা রটানো হবে। সুতরাং তোমরা আমার উদ্ধৃতি সম্বলিত বক্তব্য শুনলে সেটাকে কুরআনের সামনে উপস্থিত করো। যদি সেটা কুরআনের সাথে মিলে যায়, তবে সেটা আমার কথা। আর যদি তা না মিশে যায়, তবে আমি এমন কথা থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত”।

সকল আহলুল হাদীস আলেমদের মতে এটা বানোয়াট জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। কোনো একজন বিজ্ঞ আলেম বলেছেন: হাদীসটি আমাদের কাছে যা দাবি করেছে, আমরা হাদীসটির ব্যাপারে তাই কার্যকর করেছি। হাদীসটিকে আমরা কুরআনের সামনে উপস্থাপন করলাম। আমরা দেখলাম যে, হাদীসটির সঙ্গে এই আয়াতটি সাংঘর্ষিক:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾

“রসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা তোমরা আঁকড়ে ধরো। আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করো”। (আল হাশর ৫৯:৭)।

আরো অন্যান্য আয়াতের সাথেও এটা সাংঘর্ষিক। ফলে আমরা এই হাদীসটি বানোয়াট বলে সিদ্ধান্ত দিলাম এবং হাদীসটির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়মুক্তি ঘোষণা করলাম।[২৭]

সুন্নাহ সংরক্ষণের ব্যাপারে অন্যতম একটি দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

"নিশ্চয় আমরা যিকির নাযিল করেছি এবং আমরাই তা সংরক্ষণ করব"। (আল হিজর ১৫:৯)।

এই আয়াতটিতে যিকির সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি অকাট্য অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাহলে যিকির কী? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যিকির প্রথম পর্যায়ে অবশ্যই কুরআনকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে গবেষণা ও গভীর বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, এটা মহান সুন্নাতে নববীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এই মতটিকে কিছু সংখ্যক মুহাক্কিক আলেম সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – যিনি স্বীয় মূল্যবান গ্রন্থ "আল ইহকাম" এ (১/১০৯-১২২) একটি দীর্ঘ উপভোগ্য অনুচ্ছেদ লিখেছেন।

সেখানে তিনি সুন্নাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা কুরআনের ন্যায় সংরক্ষিত এবং আহাদ হাদীস ইলমকে নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত করে এই বিষয়ে অনেকগুলো শক্তিশালী দলীল ও বাকরুদ্ধকর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তার বক্তব্যের কিয়দাংশ (১০৯, ১১০ পৃষ্ঠা) হল: মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤﴾

"তিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা একমাত্র অহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়"। (আন নাযম ৫৩: ৩-৪) ।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে স্বীয় নবীকে – তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক – এই কথা বলার আদেশ দিয়েছেন:

[২৭] ইরশাদুল ফুহূল ইমাম শাওকানী (২৯ নং পৃষ্ঠা) সামান্য পরিবর্তনসহ।

﴿إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾

“আমার নিকট যে অহী আসে, তা ব্যতীত অন্যকোনো বিষয় আমি অনুসরণ করি না” । (আল আহক্বাফ ৪৬:৯)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

“নিশ্চয় আমরা যিকির নাযিল করেছি। আর আমরাই তা সংরক্ষণ করব”। (আল হিজর ১৫:৯)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“আমরা আপনার নিকট যিকির নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের নিকট স্পষ্টরূপে জীবন বিধান ব্যাখ্যা করতে পারেন, যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে”। (আন আন নাহল ১৬:৪৪)।

সুতরাং এটা সঠিক প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি বাণী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাষাবিদ ও আইনবিদগণের মাঝে এই বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই যে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া প্রতিটি অহী যিকির মুনাযযাল, তথা নাযিলকৃত যিকির। সুতরাং নিশ্চিতরূপে প্রতিটি অহীই আল্লাহ তা‘আলার সংরক্ষণের দ্বারা সংরক্ষিত। আর আল্লাহ তা‘আলা নিজে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এমন প্রতিটি বিষয় ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ। এবং সংরক্ষিত বস্তুটিতে বিদ্যমান বিকৃতির বর্ণনা প্রকাশিত হবে না এমন সামান্যতম বিকৃতি থেকেও নিরাপদ থাকবে। যেহেতু এর বিপরীত অবস্থাটি যদি সম্ভব হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। তাঁর সংরক্ষণের দায়ভার অকার্যকর ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আর এই ভাবনা কোনো মার্জিত বিবেকসম্পন্ন বক্তির মস্তিষ্কে উদয় হতে পারে না। বিধায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দীনকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারা নিশ্চিতরূপে সংরক্ষিত। ঠিক যেভাবে দুনিয়া বিনাশ হওয়া পর্যন্ত আগমনকারী দীনের অনুসন্ধানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এটাকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ﴾

“যাতে করে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট (দীন) পৌঁছেছে, তাদেরকে সতর্ক করতে পারি”। (আল আন‘আম ৬:১৯)।

সুতরাং যখন বিষয়টি এমনি হয়, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের ব্যাপারে বলেছেন এমন কোনো কথা হারিয়ে যেতে পারে না। একইভাবে তাঁর প্রকৃত কথার সঙ্গে বাতিল মনগড়া হাদীস এমনভাবে মিশ্রিত হতে পারে না যে, সেটা কোনো মানুষই পার্থক্য করতে পারেনি। যেহেতু এটা সম্ভব হলে যিকিরটাও অসংরক্ষিত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী:

“নিশ্চয় আমরা যিকির নাযিল করেছি এবং আমরাই তা সংরক্ষণ করব” মিথ্যা ও পরিত্যক্ত অঙ্গীকারে পরিণত হবে”। এমনটা কোনো মুসলিম বলতে পারে না।

যদি কোনো ব্যক্তি বলে: মহান আল্লাহ এই বক্তব্য দ্বারা শুধুমাত্র কুরআনকে বুঝিয়েছেন। একমাত্র এই কুরআনের সংরক্ষণের দায়ভার তিনি নিয়েছেন। কুরআন ব্যতীত অন্য সকল অহী সংরক্ষণের দায়ভার তিনি নেননি। তাহলে আমরা এর উত্তরে বলব: - একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওফীক কামনা করছি - এটা নিঃসন্দেহে একটি দলীল বিহীন মিথ্যা দাবি। কোনো দলীল ব্যতিরেকে যিকির এর মর্মকে নির্দিষ্ট করা। আর এমন যেকোনো দাবিই অসারতাপূর্ণ। দলীল হল আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী:

﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾

“আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তোমাদের অকাট্য দলীল উপস্থাপন করো”। (আন নামল ২৭:৬৪)।

সুতরাং এটা সহীহ সাব্যস্ত হল যে, যে ব্যক্তির দাবির পক্ষে কোনো অকাট্য দলীল নেই, সে তার দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী নয়। আর যিকির এমন একটি নাম, যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে নাযিল করেছেন এমন সকল অহীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। চাই তা কুরআন হোক অথবা সুন্নাহ, যা দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা হয়। আর আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾

“আমরা আপনার প্রতি যিকির নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি মানুষদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত অহীর স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাদেরকে বর্ণনা করতে পারেন”। (আন নাহল ১৬:৪৪)।

সুতরাং এটাও সহীহ সাব্যস্ত হল যে, নবী আলাইহিস সালাম মানুষের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে আদিষ্ট। আর কুরআনের মাঝে সালাত, যাকাত, হজ্জ ও এমন অনেক মুজমাল বিষয় আছে, যেগুলোর প্রকৃত পদ্ধতি শুধু সংশ্লিষ্ট শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কীভাবে ইবাদত করতে বাধ্য করেছেন তা আমরা বুঝি না। তবে একমাত্র আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা দ্বারাই আমরা সেটা বুঝতে পারি। সুতরাং উক্ত মুজমালের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা যদি অসংরক্ষিত হয়ে যায় বা ভেজালের মিশ্রণ থেকে নিরাপদ না থাকে, তবে কুরআনের দলীল এর দ্বারা উপকৃত হওয়া অকার্যকর সাব্যস্ত হবে। এমনকি আমাদের উপরে ফরযকৃত শরীআতের অধিকাংশ পরিমাণই বাতিল হয়ে যাবে। আর তখন বিধানগুলোর ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তা‘আলার উদ্দিষ্ট সহীহ মর্ম অনুধাবনে অক্ষম হয়ে পড়ব। অর্থাৎ যেখানে কোনো ব্যক্তি ভুলের শিকার হয়েছেন অথবা কোনো মিথ্যাবাদী ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা বলেছে এমন স্থানে আমরা আল্লাহর বিধানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারব না। আল্লাহর নিকট এই আশ্রয় চাই এমন ভুলের শিকার হওয়া থেকে।

আমি বলব: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহ তা‘আলা – ইবনু হাযমের এই বক্তব্য সহ অন্যাদের বক্তব্য তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুখতাসারুস সাওয়াঈকিল মুরসালাহ গ্রন্থে (৪৮৭ – ৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উদ্ধৃত করেছেন এবং এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন এবং উত্তম বলেছেন। উদ্ধৃতির পরে তিনি বলেছেন: “এই বক্তব্য, যা আবূ মুহাম্মাদ – অর্থাৎ ইবনু হাযম – বলেছেন, তা নিশ্চিত সত্য ঐ সকল হাদীসের ব্যাপারে, যেগুলো উম্মাহ আমল ও আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। গরীব হাদীস এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা উম্মাহর নিকট যেটার গ্রহণযোগ্যতা জানা যায়নি”। এই মতটি আরো যারা গ্রহণ করেছেন তাদের মাঝে অন্যতম হলেন ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক। তাকে যখন প্রশ্ন করা হল: এই জাল হাদীসগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন? তিনি উত্তর দিলেন: সেগুলোকে নির্ণয়ের জন্য মনীষী ব্যক্তিগণ বেঁচে আছেন। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

“নিশ্চয় আমরা যিকির নাযিল করেছি। আর আমরাই তার হেফাযত করব”[২৮]। এমন বক্তব্য ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী – রহিমাহুল্লাহ – থেকেও বর্ণিত হয়েছে”।

এই মতের অন্যতম আরেকজন প্রবক্তা হলেন উযীর আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম। তিনি পূর্বোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করার পরে বলেছেন: “এই আয়াতের দাবি হল, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীআত চিরদিন সংরক্ষিত থাকবে। আর তাঁর সুন্নাহ চিরকাল নিরাপত্তায় ঢাকা থাকবে”[২৯]।

অন্যতম আরেকটি দলীল এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী ও রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর শরীআতকে সর্বশেষ শরীআত বানিয়েছেন। আর তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর শরীআতের অনুকরণকে মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রতিটি শরীআতকে তিনি অকার্যকর ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার অন্যতম দাবি হল তাঁর – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – দীনকে অবশিষ্ট রাখা এবং তাঁর আইনকে সংরক্ষণ করা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা অসম্ভব যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে এমন শরীআত মানতে বাধ্য করবেন, যা বিলুপ্তি ও বিনাশের উপযুক্ত। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, ইসলামী শরীআতের প্রধান দুইটি উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾

“যদি তোমরা কোনো বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হও, তাহলে সেই বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট সমর্পণ করো” (আন নিসা: ৫৯)। তিনি – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – আরো বলেছেন:

“জেনে রাখো, আমাকে কুরআন ও কুরআনের সাথে এর ন্যায় আরেকটি বস্তু দান করা হয়েছে (অর্থাৎ সুন্নাহ)”[৩০]।

---

[২৮] সুয়ূতী রচিত তাদরীবুর রাবী (১০২ নং পৃষ্ঠা)। আহমাদ শাকির রচিত আল বাঈছুল হাছীছ (৯৫ নং পৃষ্ঠা)।

[২৯] আর রওযুল বাসিক ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবীল কাসিম (৩৩ নং পৃষ্ঠা)।

[৩০] হাদীসটি সহীহ সনদে আবূ দাউদ সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছে।

আর কুরআন সংরক্ষিত; যেহেতু সেটা মুতাওয়াতির সনদে আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত হয়ে এসেছে। যা হাদীস সাব্যস্ত হওয়ার স্তরগুলোর মাঝে সর্বোচ্চস্তর। এবং কুরআন এই কারণেও সংরক্ষিত যে, সুন্নাহই কুরআনের একমাত্র ব্যাখ্যাকারী ও তাফসীরকারী, কুরআনের ব্যাপকতাকে নির্দিষ্টকারী এবং এর সাধারণ মর্মকে সীমাবদ্ধকারী। সুন্নাহ ব্যতীত কুরআন বুঝা ও এর উপরে আমল করা কোনোটাই সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আমরা আপনার নিকট যিকির নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি মানুষের নিকট তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হওয়া অহীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে পারেন। আর তারা যেনো চিন্তা-ফিকির করতে পারে" (আন নাহল ১৬: ৪৪) ।

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই সুন্নাতের মাধ্যমে মানুষের উদ্দেশ্যে নাযিল হওয়া আল্লাহ তা'আলার কালামের ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট বর্ণনা তাদেরকে বর্ণনা করে দিবেন। সুতরাং এর দ্বারা অবধারিতরূপেই এটা আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সুন্নাহকে সংরক্ষণ করবেন এবং সেটাকে অবশিষ্ট রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আর এই ক্ষেত্রেও এই কথিত সহীহ উসূলী মূলনীতিটা প্রযোজ্য হবে:

"যেই বিষয়টি ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণাঙ্গ হয় না, সেটাও ওয়াজিব"।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দলীল তাঁর বান্দাদের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হবে না তাঁর রিসালাত ও শরীআত সংরক্ষণ ব্যতীত। আর এই সংরক্ষণ সুন্নাতের সংরক্ষণ ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং এর দ্বারা সুন্নাহ সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত হল। আর এটাই আমাদের দাবি।

আমার পাঠক ভাই, এই বিষয়গুলোকে সূচনালগ্নে উপস্থাপন করাটা আমি পছন্দ মনে করেছি। এখন আমার জন্য হাদীসের লাগাম আমাদের মহান উস্তাদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানীর হাতে অর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তিনিই আমাদের সামনে তার সুমিষ্ট বর্ণনা ও ইলমী বাচনভঙ্গি দ্বারা হাদীসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আমরা পূর্ণ মনোযোগের সাথে তার আলোচনা শ্রবণ করব। তার বক্তব্য আমাদের অন্তর ও বিবেক দ্বারা পর্যবেক্ষণ করব। আস সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها

প্রথম অনুচ্ছেদ:

সুন্নাতের পথে ফিরে আসা ফরয ও এর বিরোধিতা করা হারাম।

সম্মানিত ভাতৃবৃন্দ: প্রথম যুগের সকল মুসলিমদের মাঝে ঐকমত্যপূর্ণ একটি বিষয় হল যে, সুন্নাতে নববী (সর্বোচ্চ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সুন্নাতের প্রবর্তক এর উপর) জীবনের প্রতিটি শাখায়, গায়েবী আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, আমল অথবা রাষ্ট্রনীতি অথবা শিষ্টাচার সংক্রান্ত বিধানগুলোতে ইসলামী শরীআর দ্বিতীয় ও শেষ উৎস। কোনো রায়, ইজতিহাদ অথবা কিয়াস কোনোটি দ্বারাই সুন্নাতের বিরোধিতা করা যাবে না।

যেমন ইমাম শাফেঈ – রহিমাহুল্লাহ – আর রিসালাহ গ্রন্থের শেষে বলেছেন:

لا يحل القياس والخبر موجود.

"হাদীসের উপস্থিতিতে কিয়াস বৈধ নয়"।

একই রকম আরেকটি কথা পরবর্তী উসূলবিদ আলেমগণের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে:

إذا ورد الأثر بطل النظر.

"যখন আসার বিদ্যমান থাকে, নযর (কিয়াস নির্ভর বিশ্লেষণ) বাতিল হয়ে যায়"।

لا اجتهاد في مورد النص.

"দলীলের উপস্থিতিতে কোনো ইজতিহাদ করা যাবে না"।

আর এই বক্তব্যে তাদের দলীলের ভিত্তি হল মহান কিতাব ও সুন্নাহ মুত্বাহহারাহ।

القرآن يأمر بالاحتكام إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

কুরআন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের কাছে স্মরণাপন্ন হওয়ার আদেশ প্রদান করে:

আল্লাহর কিতাবে এমন বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর আংশিক উপদেশের প্রদানের লক্ষ্যে এই ভূমিকাতে উপস্থাপন করার বিনিময়ে সওয়াবের আশা করছি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

{فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}

"যেহেতু উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে":

১ – আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٖ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ﴾

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর এই অধিকার থাকে না যে, তারা (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে) তাদের কোনো সিদ্ধান্তকে বেছে নিবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করল, সে অবশ্যই স্পষ্টরূপে পথভ্রষ্ট হল" (আল আহযাব ৩৩:৩৬)।

২ – মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা (কোনো বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে যেয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী" (আল হুজুরাত ৪৯:১) ।

৩ – তিনি বলেছেন:

﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

“আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে (জেনে রাখো) আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না” (আলে ইমরান ৩:৩২) ।

৪ – মহান বক্তা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ٧٩ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا﴾

“আমরা আপনাকে মানব জাতির রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের ব্যাপারে আমি আপনাকে পর্যবেক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করিনি” (আন আন নিসা ৪: ৭৯, ৮০) ।

৫ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল, এবং তোমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য করো। যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে সেই বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দ্বারস্থ হও। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ঈমান স্থাপন করে থাক। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান” (সূরা আন নিসা ৪:৫৯) ।

৬ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

“তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো আর পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে

যাবে। আর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন" (সূরা আল আনফাল ৮:৪৬)।

৭ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং সাবধান থাকো। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের দায়িত্ব শুধুমাত্র স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া" (সূরা আল মায়িদাহ ৫:৯২) ।

৮ –তিনি আরো বলেছেন:

﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمۡ لِوَاذٗاۚ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"তোমরা তোমাদের মাঝে প্রচলিত একে অপরকে ডাকার নিয়মানুসারে রসূলকে ডাক দিয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে ঐ সকল ব্যক্তিকে চিনেন, যারা চুপিসারে (রসূলের আদর্শ থেকে) বের হয়ে যায়। সুতরাং যারা তাঁর (রসূল) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেনো সাবধান থাকে। যেকোনো মুহূর্তে তাদের প্রতি কোনো বিপদ অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হতে পারে" (সূরা আন নূর ২৪:৬৩) ।

৯ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে আহবান করা হয় তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চারকারী বিষয়ের দিকে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার অন্তরের

মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। আর তাঁর নিকতেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে” (সূরা আল আনফাল ৮:২৪) ।

১০ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝١٣ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

“যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে চিরকাল নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর এটা মহান সাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর (আল্লাহর) সীমা লঙ্ঘন করবে, তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন চিরস্থায়ীরূপে। আর তার জন্য সেখানে রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি” (সূরা আন নিসা ৪: ১৩, ১৪)।

১১ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ ۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ۝٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾

“আপনি কি ঐ সকল ব্যক্তিকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, তারা আপনার নিকট নাযিলকৃত এবং আপনার পূর্বে নাযিলকৃত অহীর উপরে ঈমান রাখে। অথচ তারা তাদের মামলা নিষ্পত্তির জন্য ত্বাগূতের দ্বারস্থ হতে চায়। উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে ত্বাগুতকে অস্বীকার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়ত্বান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য থেকে বহু দূরে ঠেলে দিতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর নাযিলকৃত অহীর পথে এবং রসূলের পথে, তখন আপনি মুনাফিক্বদেরকে দেখবেন, তারা কঠোরভাবে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে” (সূরা আন নিসা ৪: ৬০, ৬১)।

১২ – মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٥١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾

"যখন মুমিনদেরকে তাদের মাঝে মীমাংসার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে আহবান করা হয়, তখন তাদের একমাত্র এই কথা বলে উত্তর দেয় যে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই হল প্রকৃত সফল। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে, তারাই প্রকৃত বিজয়ী" (সূরা আন নূর ২৪:৫১, ৫২)।

১৩ – তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾

"রসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা আঁকড়ে ধরো। আর যে সকল বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোকে পরিহার করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শাস্তির বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর" (সূরা আল হাশর ৫৯:৭)।

১৪ – আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি উত্তম আদর্শ ঐ ব্যক্তির জন্য, যা আল্লাহকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে" (সূরা আল আহযাব ৩৩:২১)।

১৫ – আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ ٢ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾

"শপথ তারকাটির, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং ভ্রান্তিতে নিমজ্জিতও হননি। তিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা অহী ছাড়া কিছুই নয়" (সূরা আন নাজম ৫৩:১-৪)।

১৬ – আল্লাহ তা'আলা – যিনি মহিমান্বিত – আরো বলেছেন:

﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আমরা আপনার প্রতি যিকির নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত অহীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাদেরকে বর্ণনা করতে পারেন। আর তারা যেনো (এই বিষয়টি সম্পর্কে) চিন্তা-গবেষণা করে" (সূরা আন নাহল ১৬:৪৪)। আরো অন্যান্য আয়াতসমূহ।

الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء

সকল বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের পক্ষে সিদ্ধান্তকারী হাদীসসমূহ:

সুন্নাহ হল এমন বিষয়, যেখানে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত আছে। যা আমাদেরকে আমাদের দীনী বিষয়াদির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃতিরূপে নবী – আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম – এর অনুকরণকে আবশ্যক করে। তোমাদের নিকট সুন্নাহ সম্পর্কিত কিছু প্রমাণিত দলীল উপস্থাপন করছি:

১ – আবূ হুরায়রা – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قالوا: ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى"

“আমার উম্মতের প্রত্যেক সদস্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করল। তারা বললেন: অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন: যে আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার বিরোধিতা করল, সে অস্বীকারকারী”। ইমাম বুখারী “আই ইতিসাম” অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২ – জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

"جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا: أولوها يفقهها فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. أخرجه البخاري أيضا.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর নিকট একদল ফেরেশতা আসল। তখন তাদের কেউ বলল: তিনি ঘুমন্ত। অন্য একজন বলল: তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু হৃদয় জাগ্রত। তখন তারা বলল: তোমাদের এই সঙ্গীর একটি দৃষ্টান্ত আছে। তোমরা তাঁর দৃষ্টান্তটি বর্ণনা করো। তখন তারা বলল: তাঁর দৃষ্টান্ত হল এমন যে, কেউ একটি ঘর নির্মাণ করলেন এরপরে সেখানে সে একটি ভোজসভার আয়োজন করলেন। এরপরে একজন আহবায়ককে প্রেরণ করলেন। যে ব্যক্তি উক্ত আহবায়কের আহবানে সাড়া দিবে, সে ঘরটিতে প্রবেশ করতে পারবে। এবং ভোজসভায় আহার করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি আহবায়কের আহবানে সাড়া দিবে না, সে ঘরটিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবং ভোজসভায় আহারও করতে পারবে না। তখন তারা বলল: তোমরা দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা বর্ণনা করো, যাতে সে এর মর্ম বুঝতে পারে। তখন তাদের কোনো একজন বলল: নিশ্চয় তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত হলেও তাঁর

হৃদয় জাগ্রত আছে। এরপরে তারা বলল: ঘরটি হল জান্নাত। আহবায়ক হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতা করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই বিরোধিতা করল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানুষের (ঈমান ও কুফর) মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড[৩১]"। হাদীসটি বুখারীও বর্ণনা করেছেন।

৩ – আবূ মূসা – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

"إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق" أخرجه البخاري ومسلم

"আমার দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেই মহান দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটার দৃষ্টান্ত হল এমন যে, কোনো ব্যক্তি স্বীয় গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে বলল: হে আমার জাতি! আমি স্বচক্ষে একটি সেনাদল দেখেছি। আর আমি হলাম একজন গুরুগম্ভীর সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা মুক্তির পথে আসো, মুক্তির পথে আসো। তখন তাঁর গোত্রের একদল লোক তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। এরপরে তারা নৈশভ্রমণ করে পথ পাড়ি দিল। এরপরে তারা সেই পথে স্থিরতার সাথে চলতে লাগল এবং মুক্তি পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে আরেকটি দল তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তারা সেই স্থানেই সকাল পর্যন্ত অবস্থান করল। আর সকালে শত্রুসেনা তাদেরকে হামলা করল। এরপরে তাদেরকে তারা ধ্বংস করল এবং সমূলে উৎপাটন করল। এটাই হল ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে, আমার আনুগত্য করল এবং আমার আনীত দীন অনুসরণ করল। এবং ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে, আমার বিরোধিতা করল এবং

[৩১] অর্থাৎ তিনি মুমিন ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী। কারণ মুমিনগণ মুমিন হয় তাঁকে সত্যায়নের দ্বারা। আর কাফেররা কাফের সাব্যস্ত হয় তাঁকে অস্বীকার করার দ্বারা।

আমার আনীত সত্য দীনকে প্রত্যতাখ্যান করল"। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৪ – আবূ রাফে' – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه "وإلا فلا". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة والطحاوي وغيرهم بسند صحيح.

"আমি যেনো তোমাদের কাউকে নিজ আসনে হেলান দিয়ে এমন অবস্থায় বসে থাকাকে পছন্দ করি না যে, তার নিকট যখন আমার কোনো আদেশ অথবা নিষেধ আসে, আর সে বলে: আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি, তাই আমি মানব (অন্যথায় আমি তা মানব না)"।

হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এবং ত্বহাবী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৫ – মিক্বদাম বিন মা'দীকারিব – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه١ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه." رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح

"জেনে রাখো, আমাকে কুরআন এবং কুরআনের ন্যায় একটি ঐশী সংবিধান দান করা হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে নিজ আসনে বসে কোনো ব্যক্তি যেনো এই কথা না বলে: তোমাদের উপরে এই কুরআনকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। এতে তোমরা যা হালাল পেয়েছে, সেটাকে হালাল মেনে নাও। আর এতে তোমরা যা হারাম পেয়েছ, সেটাকে হারাম হিসেবে মেনে নাও। আল্লাহর রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষিদ্ধকরণ আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধকরণের ন্যায় হতে পারে না। জেনে রাখো, তোমাদের জন্য পালিত গাধা হালাল নয়। এবং কোনো প্রকার চোখা ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জন্তুও হালাল নয়। এবং চুক্তিবদ্ধ যিম্মী ব্যক্তির কোনো হারানো বস্তুও হালাল নয়। তবে উক্ত ব্যক্তি তার হারানো বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী হলে সেটা ভিন্ন বিষয়। যদি কোনো ব্যক্তি (সফরকালে) কোনো গোত্রের অঞ্চলে আগমন করে, তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক কর্তব্য হল তাকে মেহমানদারি করা। যদি তারা তাকে মেহমানদারি না করে, তাহলে তার মেহমানদারির সমপরিমাণ বস্তু জোরপূর্বক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার আছে"। হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৬ – আবূ হুরায়রা – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض". أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه.

"আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বিষয় রেখে যাচ্ছি। তোমরা বিষয় দুইটির পরে (আঁকড়ে ধরার পরে) পথভ্রষ্ট হবে না (যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়টিকে তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখবে)। আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। এই দুইটি বিষয় হাউজে কাউছারে আমার নিকট আসা পর্যন্ত একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না"। হাদীসটি ইমাম মালিক মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। হাকিম মারফূ সনদে বর্ণনা করে এটাকে সহীহ বলেছেন।

উল্লেখিত পূর্ববর্তী দলীলসমূহের মর্মার্থ:

এই দলীলগুলোতে অর্থাৎ এই আয়াত ও হাদীসগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলোকে নিম্নে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল:

أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين

১ – আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও আল্লাহর রসূলের সিদ্ধান্তের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মুমিন ব্যক্তির জন্য উভয়টির কোনোটিতেই বিরোধিতা করে ভিন্ন কোনো স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতা আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতার ন্যায়। আর তা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি।

أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم

২ – কোনো সিদ্ধান্তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে অগ্রসর হওয়া জায়েয নেই। ঠিক যেমন আল্লাহ তা'আলার সামনে অগ্রসর হওয়া জায়েয নেই। আর এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের বিরোধিতা করা জায়েয না হওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষ আদেশ।

قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" "٥٨/١" :"أي لا تقولوا حتى يقول وتأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي"

ইবনুল কাইয়্যিম ইলামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (১/৫৮) বলেছেন: "অর্থাৎ তিনি কোনো কথা বলার আগে তোমরা বলো না। তিনি আদেশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা কোনো আদেশ দিও না। তিনি ফতোয়া দেওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা ফতোয়া দিও না। তোমরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করো না, যতক্ষণ না তিনি সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন ও বাস্তবায়ন করেন"।

أن المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله تعالى

৩ – রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কাফেরদের স্বভাব।

أن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من شأن الكافرين

৪ – আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যকারী মূলত আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্যকারী।

وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم

৫ – দীনের কোনো বিষয়ে মতানৈক্য বা বিবাদ সৃষ্টি হলে সেই বিষয়টিতে আল্লাহর দিকে ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে ফিরে আসা ওয়াজিব।

قال ابن القيم "٥٤/١ "فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل "يعني قوله: وأطيعوا الرسول" إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه

أوتي الكتاب ومثله معه "ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول"

ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروط الإيمان

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ একই গ্রন্থে (১/৫৪) বলেছেন:

"সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। এবং আদেশসূচক (أطيعوا) ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই মর্মের ঘোষণা স্বরুপ যে, তিনি যেই আদেশ দান করেছেন সেটাকে কিতাবের (কুরআন) মানদণ্ডে উপস্থিত না করে স্বতন্ত্ররূপে তাঁর (রসূল) আনুগত্য করা ওয়াজিব। বরং যখনি তিনি কোনো বিষয়ে আদেশ দান করেন, তখনি শর্তহীনভাবে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়। চাই তাঁর প্রদানকৃত আদেশ কিতাবে থাকুক অথবা নাই থাকুক। কারণ তাঁকে কিতাব ও এর অনুরূপ সংবিধান দান করা হয়েছে। তবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আনুগত্যের আদেশ স্বতন্ত্ররূপে দেননি। বরং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের আনুগত্যকে রসূলের আনুগত্যের অধীন করে দিয়েছেন" ।

আর এই বিষয়ে সকল আলেমের ঐকমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল তাঁর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রসূলের জীবদ্দশায় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল সরাসরি তাঁর স্মরণাপন্ন হওয়া। আর তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নতের দ্বারস্থ হওয়া। আর এটা ঈমানের অন্যতম শর্ত।

أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم

৬ — এই জাতীয় বিবাদ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে বিবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাটা শরীআতের দৃষ্টিতে মুসলিমদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া এবং তাদের শক্তি ও প্রতাপ নিঃশেষ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

التحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة

৭ — রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতা করতে সতর্কীকরণ করা হয়েছে। যেহেতু এর ফলে ইহকাল ও পরকালে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে।

استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة

৮ — নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশের বিরোধিতাকারীরা দুনিয়াতে ফিতনায় নিপতিত হওয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

وجوب الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة

৯ — রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডাকে ও তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। আর এটা কল্যাণকর জীবনের অন্যতম মাধ্যম। আর দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য এতে নিহিত রয়েছে।

أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين

১০ — নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ ও মহান সাফল্য লাভের উপায়। আর তাঁর বিরোধিতা করা এবং তাঁর সীমা লঙ্ঘন করা জাহান্নামে প্রবেশ এবং লাঞ্চনাদায়ক শাস্তির কারণ।

أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا

১১ – ইসলামের বেশধারী এবং অন্তরে কুফর লালনকারী মুনাফিক্বদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, যখন তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এবং তাঁর সুন্নাহর সমীপে মকদ্দমা পেশ করার জন্য আহবান করা হয়, তখন তারা এই আহবানে সাড়া দেয় না। বরং তারা পূর্ণরূপে সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: "سمعنا وأطعنا" وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم

১২ – মুমিনগণ মুনাফিক্বদের বিপরীতমুখী স্বভাবের। কারণ যখন তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মকদ্দমা পেশ করার জন্য আহবান করা হয়, তখন তারা এই আহবানে পূর্ণোচ্ছাসে সাড়া দেয়। আর তারা সময়ের ভাষায় এই কথা বলে: "আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম"। আর এর ফলে তারা সফলকাম হয়ে যায় এবং জান্নাতুন নাঈমের বিজয়ীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়।

كل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه فيه كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه

১৩ – আমাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন এমন প্রতিটি বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ঠিক যেভাবে তাঁর নিষেধকৃত প্রতিটি বিষয় আমাদের পরিহার করা ওয়াজিব।

أنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر

১৪ – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দীনের প্রতিটি বিষয়ে আমাদের আদর্শ ও নমুনা যদি আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের দলভুক্ত হয়ে থাকি।

وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

১৫ – আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীন ও গায়েবী বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত যতগুলো কথা বলেছেন, যেগুলো শুধুমাত্র বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; সেগুলো অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রেরিত অহী। তাঁর অগ্রভাগ ও পশ্চাতভাগ হতে তাঁর নিকট কোনো বাতিল আসতে পারে না।

وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن

১৬ – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহই হল তাঁর উপরে নাযিল হওয়া কুরআনের একমাত্র ব্যাখ্যা।

وأن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بذلك مخالف لما سبق من الآيات

১৭ – কুরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বরং আনুগত্য ও অনুকরণের দিক থেকে সুন্নাহ হল কুরআনের অনুরূপ। আর কুরআনকে সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্নকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতাকারী। তাঁর আনুগত্যকারী নয়। সুতরাং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পূর্ববর্তী আয়াতগুলোকেও অমান্যকারী।

أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"

১৮ – নিশ্চয় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত হারামের ন্যায়। এমনিভাবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত প্রতিটি এমন বিধান, যা কুরআনে বিদ্যমান নেই, সেই বিধানটিও তেমনি বাধ্যতামূলক, যেমনটা হতো কুরআনে

বিদ্যমান থাকলে। এবিষয়ের দলীল হল তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাপক মর্মের কারণে:

"জেনে রাখো, আমাকে কুরআন ও এর সাথে অনুরূপ ঐশী সংবিধান দান করা হয়েছে" ।

أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

১৯ – পথভ্রষ্টতা এবং বক্রতা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আর এটা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান একটি বিধান। সুতরাং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য বিধান করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাঁর উপরে অধিক পরিমাণে শান্তি বর্ষণ করুন।

لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام

আকীদা ও ফিকহী বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক।

সম্মানিত ভাইবৃন্দ, যেহেতু কিতাব ও সুন্নাতের পূর্ববর্তী দলীলসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত সকল বিষয়ে শর্তহীনভাবে সুন্নাতের অনুকরণ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিকে অকাট্যরূপে সাব্যস্ত করে। এবং এই বিষয়টিকেও অকাট্যরূপে সাব্যস্ত করে যে, যে ব্যক্তি সুন্নাতের আদালতে মকদ্দমা পেশ করতে এবং সুন্নাতের সামনে আত্মসমর্পণ করতে অসন্তুষ্টি বোধ করে, সে মুমিন নয়। তাই আমি আপনাদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করতে চাই যে, উক্ত দলীলসমূহ ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে আরো দুইটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করে:

প্রথমত: উক্ত দলীলসমূহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আগমনকারী এমন সকল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছেছে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে:

﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ ﴾

"যাতে করে আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট ইহা (কুরআন) পৌঁছেছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি"। সূরা আল আন'আম ৬:১৯। এই বাণীতেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ﴾

"আমরা আপনাকে সামগ্রিকরূপে সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শন-কারী রূপে প্রেরণ করেছি" (সাবা: ২৮)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটির তাফসীর নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে করেছেন:

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة

"সাধারণত প্রত্যেক নবীকে নির্দিষ্টরূপে তাঁর গোত্রের কাছে প্রেরণ করা হতো। আমাকে সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে"। মুত্তাফাক্বুন আলাইহি এবং এই বক্তব্যের মাধ্যমে:

والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار" رواه مسلم وابن منده وغيرهما "الصحيحة ١٥٧"

"শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জীবন, এই উম্মতের কোনো ব্যক্তি, ইহূদী এবং নাছারা যেকেউ আমার সম্পর্কে শুনার পরেও আমার প্রতি ঈমান আনল না, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে"। ইমাম মুসলিম ও ইবনু মানদাহ সহ আরো অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সিলসিলাহ সহীহাহ (১৫৭)।

দ্বিতীয়ত: দলীলসমূহ দীনের প্রতিটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই বিষয়টি দীনের কোনো আকীদা সংক্রান্ত হোক অথবা আমলগত বিধান হোক অথবা অন্য কিছু হোক।

সুতরাং যেভাবে প্রত্যেক সাহাবীর জন্য তার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে অথবা অন্যকোনো সাহাবীর সূত্রে তাঁর নিকট থেকে আগত দীনের প্রতিটি বিষয়েই বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব, ঠিক সেভাবে তাবেঈর নিকট সাহাবীর সূত্রে আগত দীনের প্রত্যেক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। বিধায় যেভাবে কোনো সাহাবীর জন্য উদাহরণস্বরূপ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকীদা সংক্রান্ত কোনো হাদীস সাহাবীর জন্য "এটা আহাদ হাদীস, যা তিনি তারই ন্যায় একজন সাহাবীর নিকট থেকে শুনেছেন" এই যুক্তির সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করা জায়েয নেই, ঠিক তদ্রূপ সাহাবীর পরবর্তী কোনো ব্যক্তির জন্যেও একই যুক্তির সাহায্যে হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করা জায়েয হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের রাবী তার নিকট বিশ্বস্ত বিবেচিত হবে। এই নিয়মের ধারাবাহিকতা ততদিন পর্যন্ত চলমান থাকবে, আল্লাহ তা'আলা যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর ওয়ারিস না হবেন। বিষয়টি তাবেঈন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন এর যুগে এমনি ছিল। যেই বিষয়ে ইমাম শাফেঈ – রহিমাহুল্লাহ – এর স্পষ্ট বাণী অচিরেই উল্লেখ করা হবে।

পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরসুরীদের সুন্নাতের আদালতে মকদ্দমা পেশ করার পরিবর্তে সুন্নাতের মাঝে আধিপত্য বিস্তারকরণ সম্পর্কে।

পরবর্তীতে একদল অযোগ্য উত্তরসুরী স্থলাভিষিক্ত হল, যারা নবীর সুন্নাহকে বিকৃত করেছে এবং কালাম শাস্ত্রের কিছু আলেমদের তৈরীকৃত উসূলের কারণে অবহেলা করেছে। আর এমন অনুমান নির্ভর নীতিমালার কারণে, যেগুলো কিছু উসূলবিদ আলেম ও মুকাল্লিদ ফকীহগণ রচনা করেছেন। যেগুলোর অন্যতম ফলাফল হল উল্লিখিত সুন্নাতের অবহেলা, যা পর্যায়ক্রমে সুন্নাহর একটি বিরাট অংশের মাঝে সন্দেহের জন্ম দেয় এবং সুন্নাতের অপর অংশকে প্রত্যাখ্যান করার পথে পৌঁছে দেয়। যেহেতু সেটা উক্ত নীতিমালা ও উসূলের পরিপন্থি। ফলে যখন তাদের নিকট কোনো আয়াতটির মর্ম পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তারা মর্মোদ্ঘাটনে সুন্নাতের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে তারা তাদের মৌলিক নীতিমালা ও উসূলের প্রতি মনোনিবেশ করে। সুতরাং তারা আসল নির্দেশটিকেই উল্টে দেয়। আর সুন্নাতের মর্ম তাদের মৌলিক নীতিমালা ও উসূলের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে থাকে।

বিধায় সুন্নাহর কোনো বিষয় তাদের মৌলিক নীতিমালা ও উসূলের মুওয়াফিক্ব হলে তারা সেটাকে গ্রহণ করে। অন্যথায় তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এর দ্বারা ব্যক্তি মুসলিমের মাঝে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে পরিপূর্ণ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিশেষভাবে পরবর্তী মুসলিমদের নিকট। ফলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, তার আকীদা সম্পর্কে, তাঁর সীরাত সম্পর্কে, তাঁর ইবাদত সম্পর্কে, তাঁর সিয়াম সম্পর্কে,

তাঁর কিয়াম, হজ্জ, বিধিবিধান ও ফতোয়া সমগ্র সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। তাই যখনই তাদেরকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তারা তোমাকে হয়ত দুর্বল হাদীস অথবা ভিত্তিহীন কোনো হাদীস দ্বারা উত্তর প্রদান করবে। অথবা অমুক মাযহাবে বলা হয়েছে এমন উত্তর দিবে। সুতরাং যখন তার উত্তরটি আকস্মিকভাবে কোনো সহীহ হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হবে এবং তাকে উক্ত হাদীসের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, তখন সে উক্ত হাদীসটি আলোচনা করবে না। এবং উক্ত হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তনও করবে না এমন কিছু সংশয়ের কারণে, যেগুলো এখন উল্লেখ করার অবকাশ নেই। আর এই সবকিছুর মূল কারণ হল, ইতোপূর্বে নির্দেশিত উসূল ও মৌলিক নীতিমালা। অচিরেই এগুলোর আংশিক আলোচনা করা হবে ইনশ আল্লাহু তা'আলা। এই মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সকল ইসলামী রাষ্ট্র, গবেষণামূলক ম্যাগাজিন ও দীনী পত্র-পত্রিকাগুলোকে গ্রাস করে ফেলেছে। সামান্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই পাওয়া যাবে এর ব্যতিক্রম। তুমি খুব স্বল্প পরিমাণ বিরল ব্যক্তিদেরকে পাবে, যারা উক্ত বিষয়গুলোতে কিতাব ও সুন্নাহ নির্ভত ফতোয়া দেয়। বরং তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণই চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাবের উপরে নির্ভর করে ফতোয়া দেয়। অথচ তারা তাদেরই মাযহাবসমূহের সীমানা লঙ্ঘন করে অন্য মতের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়, যখন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে — তাদের দাবি অনুসারে — কোনো কল্যাণ বা স্বার্থ খুঁজে পায়। আর সুন্নাহ তো তাদের মানসপট থেকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে। তবে যখন তাদের কোনো স্বার্থ হাছিলের প্রয়োজন হয়, তখন তারা সেটাকে আঁকরে ধরে। যেমনটি তাদের অনেকেই “তিন” শব্দ দ্বারা তালাক প্রদানের মাসআলায় ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসের সঙ্গে করেছে। অথচ এটা (তিন শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একটি তালাক বলেই বিবেচিত হতো। পক্ষান্তরে তারা এটাকে কিছু দুর্বল মাযহাবের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে! অথচ তারা সংশ্লিষ্ট মতটিকে আদর্শরূপে গ্রহণের পূর্বে হাদীসটির সঙ্গে এবং হাদীসটির দিকে আহবানকারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল।

غربة السنة عند المتأخرين

মুতাআখখিরীন (পরবর্তী) আলেমগণের মাঝে সুন্নাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা:

এই যুগে সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আলেমগণের সুন্নাতের ব্যাপারে এবং সুন্নাহ দ্বারা ফতওয়া প্রদানের ব্যাপারে ধারণা না থাকার উপরে যেই বিষয়টি স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করছে, তা হল একটি ধারাবাহিক ইসলামী পত্রিকার উত্তর। যা এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে:

“পশু-প্রাণীদেরকে কি পুনরায় উঠানো হবে? উত্তরটির শব্দে শব্দে:

“ইমাম আলূসী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন: এই বিষয়ে — অর্থাৎ পশু-প্রাণীদের পুনরুত্থান সম্পর্কে - কিতাব অথবা সুন্নাহর এমন কোনো নির্ভরযোগ্য দলীল নেই, যা মানব ও জিন জাতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী তথা বিভিন্ন বন্যপশু ও পাখিদের পুনরুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে”।

উত্তরদাতা এমন বিষয়ের উপরে নির্ভর করেই উত্তর দিয়েছেন। যা একটি আশ্চর্য বিষয়। যা তোমাদেরকে আলেমগণের সুন্নাহ সম্পর্কিত অবহেলার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে। অন্য মানুষদের বিষয়টি তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই বিষয়ে একাধিক স্পষ্ট অর্থবোধক হাদীস বিদ্যমান, যা পশু-প্রাণীদের উত্থানের ব্যাপারে এবং একজন থেকে অপর জনের বদলা নেয়া হবে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। এই বিষয়ের একটি হাদীস হল সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস:

"لتؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"

“প্রত্যেককে তার যথাযথ অধিকার আদায় করে দেওয়া হবে। এমনকি শিং বিহীন বকরীকে উপস্থিত করা হবে শিং বিশিষ্ট বকরীর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য”। ইবনু ‘উমার ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে:

{يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا}

“কাফের যখন এই কিসাস দেখবে, সে বলবে: হায়! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম” (আন নাবা: ৪০)।

অযোগ্য উত্তরসুরী আলেমগণের এমন মূলনীতিসমূহ যেগুলো সুন্নাহ পরিত্যাগের আসল কারণঃ

সেই উসূল ও মূলনীতিগুলো কী, যেগুলো অযোগ্য উত্তরসুরীগণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি সেগুলো তাদেরকে গবেষণা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সুন্নাহ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে? এই বিষয়ের উত্তরে আমি বলবঃ

মূলনীতিসমূহকে নিম্নেবর্ণিত পর্যায়গুলোতে একত্রিত করা সম্ভবঃ

১. কালাম শাস্ত্রের কিছু আলেমগণের এই মতটিঃ আহাদ হাদীস এর দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হয় না। আর আজকের কিছু মুসলিম দাঈ স্পষ্টভাষায় এই কথা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, এখান থেকে আকীদা গ্রহণ করা জায়েয নেই, বরং এটা সম্পূর্ণ হারাম।

২. এমন কিছু নীতিমালা, যেই নীতিমালাকে সংশ্লিষ্ট মাযহাবের অনুসারীগণ নিজেদের আদর্শ নীতি হিসেবে মেনে নিয়েছে। আপাতত আমার স্মৃতিতে যতটুকু মনে পড়ছে, তার আংশিক নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

ক) কিয়াসকে আহাদ হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। (আল ইলাম ১/৩২৭, ৩০০, শারহুল মানার ৬২৩ নং পৃষ্ঠা) ।

খ) উসূলের সাথে সাংঘর্ষিক হলে আহাদ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা। (আল ইলাম ১/৩২৯, শারহুল মানার ৬৪৬ নং পৃষ্ঠা) ।

গ) কুরআনের দলীলে বর্ণিত বিধানের চেয়ে অতিরিক্ত বিধান আরোপকারী হাদীসকে এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যে, এটা কুরআনের বিধানকে রহিতকরণ। আর সুন্নাহ কুরআনকে রহিত করতে পারে না। (শারহুল মানার ৬৪৭ নং পৃষ্ঠা, আল ইহকাম ২/৬৬) ।

ঘ) পারস্পরিক অসঙ্গতি (দুইটি দলীলের মাঝে) বিদ্যমান থাকলে আমকে খাসের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। অথবা কুরআনের আম বিধানকে আহাদ হাদীসের দ্বারা খাস বা নির্দিষ্ট করা জায়েয মনে না করা। (শারহুল মানার পৃষ্ঠা নং ২৮৯-২৯৪, ইরশাদুল ফুহূল ১৩৮-১৩৯-১৪৩-১৪৪)।

ঙ) মদীনাবাসীর আমলকে সহীহ হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেওয়া।

৩. তাকলীদকে মাযহাব এবং দীন হিসেবে গ্রহণ করা।

الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ:

কিয়াস ও অন্যান্য নীতিকে হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেওয়া বাতিল হওয়া সম্পর্কে।

সহীহ হাদীসকে কিয়াস বা অন্যকোনো নীতির কারণে প্রত্যাখ্যান পূর্বে বর্ণিত নীতিমালার একটি। যেমন, মদীনাবাসীর কোনো সহীহ হাদীসের বিপরীত আমল করার কারণে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা। এটা নিশ্চিতরূপে পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর বিরোধিতা করা, যা মতানৈক্য ও বিবাদের সময় কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি প্রত্যাবর্তন ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্তকারী। আর যেই বিষয়ে আহলুল ইলমের মাঝে কোনো সন্দেহ নেই, তা হল আমাদের বর্ণিত এই জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টিতে সকল আলেমগণ একমত নন। বরং অধিকাংশ আলেমগণ এর বিরোধিতাই করেছেন এবং কিতাব ও সুন্নাতের অনুকরণের স্বার্থে তারা এগুলোর উপরে সহীহ হাদীসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেনো তারা এটা করবেন না, যেখানে হাদীসের উপরে আমল করা ওয়াজিব। যদিও হাদীসটির বিপরীতে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে অথবা হাদীসটির উপরে আমল করেছে এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে না জানা থাকে।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ আর রিসালাহ গ্রন্থে (৪২৩/১৬৪ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন:

"ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر"

“হাদীসকে ঐ সময়ই গ্রহণ করে নেয়া ওয়াজিব, যখন তা সাব্যস্ত হয়। যদিও ঐ জাতীয় হাদীসের উপরে অতীতের কোনো ইমাম আমল না করে থাকেন”।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ইলামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (১/৩২-৩৩) বলেছেন:

ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت

"ইমাম আহমাদ – রহিমাহুল্লাহ – কোনো সহীহ হাদীসের উপরে কোনো আমল, কোনো রায়, কোনো কিয়াস, কোনো ব্যক্তির মত এবং এমন কোনো সাংঘর্ষিক মত – যেটাকে অধিকাংশ মানুষ ইজমা বলে এবং সহীহ হাদীসের উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে – এর ব্যাপারে তার না জানার বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন না। এমন ইজমা এর দাবিদারদেরকে ইমাম আহমাদ মিথ্যাবাদী বলেছেন। আর তিনি এমন ইজমাকে প্রমাণিত হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেওয়াকে অনুমোদন করেননি।

একই রকমভাবে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহও তার "আর রিসালাহ আল জাদীদাহ" এর মাঝে স্পষ্টভাষায় বলেছেন:

على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع

"কোন বিষয়ে কোনো দ্বিমত সম্পর্কে জানা না গেলেই তাকে ইজমা বলা যায় না।

আর শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর ইজমা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দলীলসমূহের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে সেগুলোকে আপন অবস্থায় বহাল রাখা ইমাম আহমাদ ও সকল হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। যেই কল্পিত ইজমা সর্বোচ্চ এতটুকু নিশ্চয়তাবিশিষ্ট যে, কল্পিত ইজমা এর সাংঘর্ষিক দলীল সম্পর্কে না জানা। যদি এটা বৈধ হতো, তাহলে দলীলসমূহ বাতিল হয়ে যেত। আর কোনো মাসআলার বিধানে বিদ্যমান কোনো সাংঘর্ষিক দলীল আছে বলে জানে না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মাসআলায় সাংঘর্ষিক দলীল সম্পর্কে তার অজ্ঞতাকে দলীলসমূহের উপরে (দলীল তথা কল্পিত ইজমা এর সাথে সাংঘর্ষিক দলীল বাস্তবে বিদ্যমান থাকলেও) প্রাধান্য দেওয়া বৈধ হতো"।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ (৩/৪৬৪ – ৪৬৫) আরো বলেছেন:

"আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসকে যারা রায়, কিয়াস, অথবা ইসতিহসান অথবা যেকোনো মানুষের কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিকরূপে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতো, মহান সালাফগণ তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং ক্রুদ্ধভাবে তাদের নিন্দা করতেন। এমন কর্মের কর্তাকে তারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতেন। হাদীসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী ব্যক্তিদেরও তারা বিরোধিতা করতেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে আনুগত্য ও বিনা শর্তে মেনে নেয়া, শ্রবণ ও আনুগত্যকে অনুমোদন দিতেন না। তাদের অন্তরে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে

কোনো দ্বিধা-সংশয় উদয় হতো না। যার ফলে তাদের জন্য হাদীস গ্রহণে কারোর আমল অথবা কিয়াস অথবা অমুকের বা অমুকের মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উপরে আমল করতেন:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

"আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর এই অধিকার থাকে না যে, সে স্বেচ্ছাধীনভাবে দ্বিতীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে" (আল আহযাব ৩৩:৩৬)।

এর দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমরা এমন যুগে এসে পড়েছি, যেখানে কাউকে যদি বলা হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি এই এই কথা বলেছেন। তখন এ বলে: এই মতটি কে গ্রহণ করেছে? হাদীসের বক্ষে আঘাত করে। আর এই হাদীসের বর্ণিত মতের প্রবক্তা সম্পর্কে তার অজ্ঞতাকে হাদীসটির বিরোধিতা করার এবং সেটার উপরে আমল না করার পক্ষে দলীল বানিয়ে নেয়। যদি সে নিজের কল্যাণকামী হয়ে থাকে, তাহলে সে অনুধাবন করতে পারবে যে, এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি অসার ও বাতিল কথা। এবং তার জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসকে এই জাতীয় অজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা মোটেও জায়েয নয়। আর এর চেয়েও নিকৃষ্ট হল তার অজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত অপারগতা।

যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে, উক্ত সুন্নাতের বিপরীতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটা মুসলিদের জামাআতের ব্যাপারে তার খারাপ ধারণা। কারণ সে এই ধারণার মাধ্যমে মুসলিমদের জামাআতকে "তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের বিরোধিতা করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করার" সাথে সম্বন্ধিত করেছে। আর এর চেয়েও নিকৃষ্ট হল এই ইজমা এর দাবির ব্যাপারে তার অপারগতা। যা হাদীসটির স্বপক্ষে কোনো আলেমের মত বিদ্যমান আছে কি না সেই বিষয়ে তার অজ্ঞতা ও না জানার উপরে নির্ভরশীল। ফলে বিষয়টি পুনরায় সুন্নাতের উপরে তার অজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়ার সাথেই আবার সম্পর্কিত হল। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আমি বলব: যখন সুন্নাতের বিরধিতাকারীর এমন অবস্থা, অথচ সে মনে করে যে, আলেমগণ সুন্নাহটির বিপরীতে একমত হয়েছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কত ভয়াবহ যে জানে যে, অনেক আলেমগণ সুন্নাহটির পক্ষে মত দিয়েছেন। তথাপি সে সেটার বিরোধিতা করে। আর যারা সুন্নাহটির বিরধিতা করেছে, তাদের নিকট পূর্বে উল্লিখিত নীতিমালা অথবা তাকলীদ ব্যতীত অন্যকোনো দলীল নেই। তাকলীদ বিষয়ে আলোচনা চতুর্থ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে।

سبب الخطأ في تقديم القياس وأصولهم على الحديث

কিয়াস ও উসূলকে হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার ভুলের কারণ:

আমার দৃষ্টিতে সুন্নাতের উপরে পূর্বে বর্ণিত নীতিমালাকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুলের উৎপত্তিস্থল হল, সুন্নাতের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, এটা এমন স্তরের অহী, যা সরাসরি আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার নাযিলকৃত অহীর চেয়ে নিম্ন মানের। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হল, সুন্নাহ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের সংশয়। অন্যথায় তাদের জন্য কিয়াসকে এর উপরে প্রাধান্য দেওয়া কীভাবে জায়েয হল। অথচ তারা এটা জানে যে, কিয়াস রায় ও ইজতিহাদের উপরে নির্ভরশীল। এবং এটা জানা কথা যে, কিয়াস ভুলের শিকার হয়। আর এই জন্যেই প্রয়োজন ব্যতীত কিয়াসের পথে যাওয়া যাবে না। যেমনটি ইমাম শাফেঈ – রহিমাহুল্লাহ – এর বক্তব্যে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে:

"হাদীস বিদ্যমান থাকাবস্থায় কিয়াস করা বৈধ নয়" । আর কীভাবে তাদের জন্য সুন্নাতের উপরে কোনো শহরের অধিবাসীদের আমলকে প্রাধান্য দেওয়া বৈধ মনে হয়। অথচ তারা এটাও জানে যে, মতানৈক্যের ক্ষেত্রে তারা সুন্নাহর দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

ইমাম সুবুকী মাযহাবের এমন অনুসারীর ব্যাপারে কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, যে এমন একটি হাদীস পেয়েছে, যা তার মাযহাব গ্রহণ করেনি এবং তার মাযহাব ব্যতীত অন্যকোনো মাযহাবের কোনো আলেমও সেটা গ্রহণ করেনি:

“হাদীসের অনুকরণই আমার নিকট সর্বোত্তম। মানুষ যেনো নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে অবস্থান করছে এমন দৃশ্য কল্পনা করে ভেবে দেখে যে, সে যদি উক্ত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি শুনত, তাহলে কি তার জন্য সেটার উপরে আমল না করা তার জন্য সম্ভব হতো?! আল্লাহর শপথ, সম্ভব হতো না। আর প্রত্যেকেই তার বুদ্ধিমত্তা অনুসারে দায়িত্বশীল”[৩২] ।

আমি বলি: এই বক্তব্যটি আমাদের পূর্বে আলোচিত বক্তব্যকে আরো শক্তিশালী করে যে, সুন্নাহ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের সংশয়ই তাদেরকে উক্ত ভুলের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। অন্যথায় তারা যদি সুন্নাতের ব্যাপারে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন বলে নিশ্চিতভাবে জানত, তাহলে তারা উক্ত নীতিমালা মুখেও উচ্চারণ করত না। সেগুলোকে বাস্তবায়ন করা এবং সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত শত শত হাদীসের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা। তবে এই বিষয়ে রা, কিয়াস এবং একদল মানুষের আমলের অনুকরণ করা ব্যতীত তাদের নিকট অন্যকোনো দলীল নেই। বরং সহীহ আমল হল তাই, যা সুন্নাহসম্মত হয়। আর এর উপরে বৃদ্ধি করা দীনের মাঝে বৃদ্ধি করার নামান্তর। এবং এর মাঝে হ্রাস করা দীনের মাঝে হ্রাস করার নামান্তর। ইবনুল কাইয়্যিম (১/২৯৯) উল্লিখিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস এর ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন:

“প্রথমটি হল কিয়াস, দ্বিতীয়টি হল আমকে বাতিল পন্থায় নির্দিষ্টকরণ। উভয়ের প্রত্যেকটিই দীন বহির্ভূত। আর যে ব্যক্তি দলীলসমূহের সাথে গভীরভাবে অবস্থান করে না, সে কখনো কখনো দলীলের মাঝে এমন বিষয় বৃদ্ধি করে, যা দলীলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর সে বলে: এটা কিয়াস। আবার কখনো কখনো দলীলের দাবিকে সে বাদ দিয়ে দেয়, এমনকি সেটাকে দলীলের বিধান থেকে বিলুপ্ত করে দেয় এবং বলে: এটা তাখসীস। আবার কখনো কখনো সমগ্র দলীলকেই পরিহার করে এবং বলে: এই দলীলের উপরে আমল সাব্যস্ত হয়নি। অথবা বলে: এটা কিয়াসের বিপরীত। অথবা উসূলের বিপরীত। তিনি বলেছেন: আর আমরা দেখেছি যে, যতবার কোনো ব্যক্তি কিয়াসের গভীরে প্রবেশ করেছে, ততবারই সে সুন্নাতের বিরোধিতায় কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

[৩২] পুস্তিকা: “ইমাম মুত্তালিবীর এই বাণীর মর্মার্থ: যখন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, তখন সেটাই আমার মাযহাব”। (মাজমূআতুর রাসায়িলিল মুনীরীয়াহ ৩য় খণ্ড, ২ নং পৃষ্ঠা) ।

আমরা রায় ও কিয়াসের অনুসারীদের ব্যতীত অন্য কাউকে সরাসরি সুন্নাহ ও আসারের বিরোধিতা করতে দেখিনি। হায় আল্লাহ, আফসোস! কত স্পষ্ট সহীহ সুন্নাহকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। কত আসারের বিধান এর (কিয়াস) কারণে মুছে দেওয়া হয়েছে। যেনো সুন্নাহ ও আসারসমূহ যুক্তি ও কিয়াসের অনুসারীদের নিকট নিজ ভূমিতে অধোমুখে পতিত গাছপালার ন্যায়, যেগুলোর বিধানসমূহ অকার্যকর, যেগুলোর কার্যক্ষমতা ও সামর্থ বিদূরীত হয়ে গিয়েছে। যার শুধুমাত্র নামই অবশিষ্ট আছে, বিধান অন্যের অধীনে। যার মূল্যায়ন হয় শুধুমাত্র অর্থের লেনদেন আর ভাষণের ক্ষেত্রে। আদেশ-নিষেধ অন্যের অধীনে। অন্যথায় সুন্নাহকে কেনো পরিত্যাগ করা হলো?

উক্ত নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক সহীহ হাদীসসমূহের কিছু উদাহরণ:

১ –স্ত্রীর জন্য – যদি সে কুমারী হয় – বৈবাহিক চুক্তি সূত্রে বিবাহের প্রথম রাত্রি থেকে ধারাবাহিক পরবর্তী সাত রাত্রি পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে যাপনের নিজস্ব অধিকার সাব্যস্ত হয় অথবা তিন রাত্রি পর্যন্ত রাত্রিযাপনের অধিকার সাব্যস্ত হয়, যদি সে বিবাহিতা (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা হয়) হয়। এরপরে সমানভাবে সকলের মাঝে রাত্রিযাপনের পালা বন্টন করে দিতে হয়। এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হাদীস।

২ – অবিবাহিত ব্যভিচারীকে দেশান্তর করে দেওয়ার হাদীস।

৩ – হজ্জের মাঝে শর্ত যুক্ত করা, শর্তের মাধ্যমে ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয হওয়া সম্পর্কিত হাদীস।

৪ – জাওরাব (উল অথবা সুতা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি লম্বা মোজা) এর উপরে মাসাহ করা সম্পর্কিত হাদীস।

৫ – ভুলে যাওয়ার কারণে অথবা না জানার কারণে কথা বললে সালাত নষ্ট হয় না মর্মে আবূ হুরায়রা ও মুআবীয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামী থেকে বর্ণিত হাদীস।

৬ – ফজরের এক রাকাত সালাত আদায় করার পরে যদি সূর্যোদয় হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ফজরের সালাত পূর্ণ করা সম্পর্কিত হাদীস।

৭ – ভুলবশত খেয়ে ফেললে সিয়াম সম্পূর্ণ করা সম্পর্কিত হাদীস।

৮ — মৃতব্যক্তির পক্ষে সিয়াম রাখা সম্পর্কিত হাদীস।

৯ — সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ এমন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা সম্পর্কিত হাদীস।

১০ — একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে শপথ গ্রহণ করে ফায়সালা দেওয়া সম্পর্কিত হাদীস।

১১ — এক চতুর্থাংশ দীনার পরিমাণ মূল্যের কোনো বস্তু চুরির ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা সম্পর্কিত হাদীস।

১২ — যে ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করবে তাকে হত্যা করা এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কিত হাদীস।

১৩ — কোনো মুমিনকে কাফেরের বিপরীতে হত্যা না করা সম্পর্কিত হাদীস।

১৪ — মুহাল্লিল (যে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে) ও মুহাল্লাল লাহু (যে নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের জন্য হালাল করার স্বার্থে) উভয়ের উপরে আল্লাহ তা'আলার লানত বা অভিসম্পাত সম্পর্কিত হাদীস।

১৫ — অলী (অভিভাবক) ব্যতীত বিবাহ হবে না এই সম্পর্কিত হাদীস।

১৬ — তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য কোনো বসবাসের ব্যবস্থা ও খাবারের ব্যবস্থা নেই এই সম্পর্কিত হাদীস।

১৭ — তাকে (নারীকে) মহর প্রদান করো লোহার তৈরী একটি আংটি দিয়ে হলেও সম্পর্কিত হাদীস।

১৮ — ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ বৈধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস।

১৯ — প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম এই সম্পর্কিত হাদীস।

২০ — পাঁচ ওয়াসাক্ব এর নীচে কোনো যাকাত নেই সম্পর্কিত হাদীস।

২১ — মুযারাআহ (উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে জমি চাষের জন্য বর্গা দেওয়া) ও মুসাক্বাহ (উৎপাদিত ফলের বিনিময়ে শুধুমাত্র গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া) সম্পর্কিত হাদীস।

২২ – গর্ভধারিণী পশুকে যবাই করাটাই তার গর্ভস্থ বাচ্চার যবাই বলে গণ্য হবে এই সম্পর্কিত হাদীস।

২৩ – বন্ধক রাখা পশুর উপরে আরোহন ও এর দুগ্ধ পান করা বৈধ এই সম্পর্কিত হাদীস।

২৪ – মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস।

২৫ – দুগ্ধপোষ্য শিশুর একবার ও দুইবার দুধ চোষণ (বিবাহ করার সম্পর্ক) হারাম করে না এই সম্পর্কিত হাদীস।

২৬ – তোমার উপরে এবং তোমার সম্পদের উপরে তোমার পিতার অধিকার আছে এই সম্পর্কিত হাদীস।

২৭ – উটের গোশত ভক্ষণ করলে উযূ করতে হয় এই সম্পর্কিত হাদীস।

২৮ – পাগড়ীর উপরে মাসাহ করার হাদীসসমূহ।

২৯ – কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায়কারীকে পুনরায় সালাত আদায় করার আদেশ সম্পর্কিত হাদীস।

৩০ – যে ব্যক্তি জুমআর দিন ইমাম খুতবা দেওয়া অবস্থায় প্রবেশ করবে সে তাহইয়াতুল মাসজিদের সালাত আদায় করবে এই সম্পর্কিত হাদীস।

৩১ – অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জানাযার সালাত (গায়েবানা জানাযা) আদায় করা।

৩২ – সালাতে উচ্চস্বরে আমীন বলা সম্পর্কিত হাদীস।

৩৩ – পিতা তার সন্তানকে দান করে দেওয়া কোনো বস্তু তার নিকট থেকে পুনরায় ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। পিতা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য এটা জায়েয নয়। এই সম্পর্কিত হাদীস।

৩৪ – যদি ঈদের দিবস সম্পর্কে ঈদের দিন সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে যাওয়ার পরে জানা যায়, তাহলে পরের দিন ঈদগাহে যেতে হবে এই সম্পর্কিত হাদীস।

৩৫ – সাধারণ খাবার খাওয়া শুরু করেনি এমন শিশুর পেশাব কোথাও লাগলে সেখানে শুধুমাত্র পানি ছিটালেই যথেষ্ট হবে এই সম্পর্কিত হাদীস।

৩৬ – কবরের সামনে জানাযার সালাত আদায় করা সম্পর্কিত হাদীস।

৩৭ – জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ এর নিজের উট বিক্রি করা এবং সেটাতে সওয়ার হয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার[৩৩] শর্ত আরোপ করা সম্পর্কিত হাদীস।

৩৮ – হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস।

৩৯ – তোমাদের কেউ যেনো তার প্রতিবেশীকে নিজের দেয়ালে কাটা পুঁততে বাঁধা না দেয় এই সম্পর্কিত হাদীস।

৪০ – যদি কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আর তার অধীনে আপন দুইবোন স্ত্রী হিসাবে থাকে, তাহলে সে স্বেচ্ছায় উভয়ের যেকোনো একজনকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে এই সম্পর্কিত হাদীস।

৪১ – যানবাহনে বসা অবস্থায় বেতেরের সালাত আদায় করা সম্পর্কিত হাদীস।

৪২ – প্রত্যেক কর্তনদাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী হারাম এই সম্পর্কিত হাদীস।

৪৩ – সালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখা[৩৪] অন্যতম একটি সুন্নাহ এই সম্পর্কিত হাদীস।

৪৪ – ঐ সালাত পরিপূর্ণ হয় না, যেই সালাতে রুকূ ও সেজদায় ব্যক্তি তার মেরুদণ্ড যথাযথভাবে সমান রাখে না এই সম্পর্কিত হাদীস।

৪৫ – সালাতে রুকূ এর সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় দুই হাত উঠানো সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

৪৬ – সালাতের শুরুতে পাঠযোগ্য দুআসমূহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

---

[৩৩] ঘটনাটি খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ঘটেছিল। জাবির রদ্বীয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার উটটি বিক্রি করেছিলেন এবং সেই উটেই তিনি মদীনা পর্যন্ত গমন করবেন মর্মে শর্ত আরোপ করেছিলেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নিয়েছিলেন। বিধায় এই হাদীস থেকে কোনো পশু বা বাহন বিক্রি করার সময় উক্ত পশু বা বাহন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহার করার শর্ত আরোপ করা বৈধ বলে সাব্যস্ত হল।

[৩৪] এই বিষয়ে মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ মতানৈক্য পোষণ করেন, যারা সালাতে উভয় হাত ছেড়ে দাঁড়ানোর মতকে গ্রহণ করেছেন।

৪৭ – তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে সালাতে অন্যান্য বিষয় হারাম হয়। আর সালাতের সমাপ্তি হয় তাসলীম অর্থাৎ সালাম ফিরানোর মাধ্যমে” বর্ণিত হাদীস।

৪৮ – সালাতে বালিকা মেয়েকে বহন করা সম্পর্কিত হাদীস।

৪৯ – আকীকাহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

৫০ –যদি কোনো ব্যক্তি তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘরে উঁকি দেয় সম্পর্কিত হাদীস।

৫১ –নিশ্চয় বিলাল রাত্রে আযান দেয় মর্মে বর্ণিত হাদীস।

৫২ – জুমআর দিবসে সিয়াম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস।

৫৩ – সূর্যগ্রহণের সালাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সালাত সম্পর্কিত হাদীস।

৫৪ – মাদী পশুর সঙ্গে যৌনমিলন করানোর জন্য মর্দা পশুকে ভাড়া নেয়া সম্পর্কিত হাদীস।

৫৫ – মুহরিম (হাজ্জ ও ওমরার ইহরাম অবস্থায় থাকা) ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার মাথা ঢাকা যাবে না এবং তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে না এই সম্পর্কিত হাদীস।

আমি বলব: এই হাদীসগুলোর প্রত্যেকটি অথবা অধিকাংশ হাদীসগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে শুধুমাত্র পূর্বে বর্ণিত নীতিমালা অথবা কিয়াসের কারণে। এগুলোর মাঝে কিছু হাদীসকে ইবনু হাযম সম্পৃক্ত করেছেন মদীনাবাসীর আমলের কারণে সুন্নাহ পরিত্যাগকারীদের দিকে। তোমাদের নিকট তাদের সুন্নাহ পরিত্যাগ করার আরো দৃষ্টান্ত রাখা হলো। যেগুলোর মাঝে অন্যতম হল নিম্নেবর্ণিত এই হাদীসগুলোর বিরোধিতা করা:

১ – মাগরিবের সালাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সূরা তূর পাঠ করা। আর শেষ জীবনে সূরা মুরসালাত পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীস।

২ – ফাতিহা পাঠ করার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমীন বলা।

৩ – সূরা “ইনশিক্বাক্ব” এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেজদাহ করা।

৪ – সাহাবাদেরকে নিজের পেছনে বসিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাদেরকে নিয়ে বসে সালাতের ইমামতি করা। এরপরেও তারা বলে এভাবে সালাত আদায়কারীর সালাত বাতিল ।

৫ – "আবূ বকর সিদ্দীক – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় শুরু করলেন। এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং মাসজিদে প্রবেশ করলেন। এরপরে আবূ বকর – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – এর পাশে বসলেন। এমন অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের ইমামতি করলেন"। এরপরেও তারা বলে: এই হাদীসের উপরে আমল প্রচলিত নয়। এভাবে যে সালাত আদায় করে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

৬ – "তিনি যুহর ও আসরের সালাত একত্রে জমা করে আদায় করেছেন"। অর্থাৎ কোনো ভীতিকর পরিস্থিতি বা সফর[৩৫] ছাড়াই (মদীনায়) আদায় করেছেন।

৭ – "তাঁর – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – নিকট একটি পুত্র শিশু সন্তানকে আনা হল। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল, তখন তিনি পানি চেয়ে পাঠালেন। এরপরে তিনি পেশাব লেগে থাকা স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেন, ধৌত করলেন না"।

৮ – নবী – আলাইহিস সালাম – ঈদের সালাতে সূরা "ক্বফ" এবং সূরা "ক্বামার" পাঠ করতেন এই সম্পর্কিত হাদীস।

৯- তিনি সুহাইল বিন বাযযার জানাযার সালাত মাসজিদে আদায় করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীস।

১০ – "নবী – আলাইহিস সালাম – দুইজন ব্যভিচারী ইহূদীকে (রজম করেছিলেন) পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দিলেন"। এরপরেও তারা বলে: তাদেরকে (আহলুল কিতাবদেরকে) রজম করা জায়েয নেই।

---

[৩৫] ইবনু আব্বাস – রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা – এর উত্তর অনুসারে এটা কোনো সমস্যাজনিত পরিস্থিতিতে জায়েয। যেমন তাকে যখন প্রশ্ন করা হল: এর দ্বারা তিনি কী উদ্দেশ্য করেছেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন: তিনি নিজ উম্মতকে কষ্টে নিপতিত করতে চান না। (অর্থাৎএই উদ্দেশ্যেই তিনি দুই সালাত একত্রে আদায় করেছেন) ।

১১ – "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম পরিহিত অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন মর্মে বর্ণিত হাদীস"।

১২ – বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুগন্ধি ব্যবহারের হাদীস।[৩৬]

১৩ – একই সালাতে দুই সালাম ফিরানোর হাদীসসমূহ।

এই জাতীয় আরো অন্যান্য হাদীসসমূহ, যেগুলোর মাঝে বিদ্যমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশের বিরোধিতা তারা করেছে। যদি কোনো অনুসন্ধানকারী এগুলো অনুসন্ধান করে, তাহলে হয়ত এর সংখ্যা কয়েক হাজার পর্যন্ত হবে। যেমনটি ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহু বলেছেন।

আমরা কিয়াস ও অন্যান্য বিষয়কে হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার মাসআলা পূর্বে আলোচনা অধ্যয়ন করেছি। এখন আমরা কিতাব ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এবং পূর্বে বর্ণিত দলীলগুলোর আলোকে অন্য দুইটি বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। যাতে করে দুই পরিচ্ছেদে এগুলো থেকে উভয়টির প্রকৃত অবস্থা আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারি।

---

[৩৬] ইবনু হাযম রচিত আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (২/১০০-১০৫)।

الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ

আহাদ হাদীস আকীদা ও ফিকহী বিধি-বিধানের স্বতন্ত্র দলীল

আহাদ হাদীস এর দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হয় না এই মতের প্রবক্তাগণ একই সাথে এই কথা স্বীকার করেন যে, শারঈ আহকাম আহাদ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা মূলত আকায়েদ ও আহকাম এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করছে। তুমি পূর্বে অতিক্রান্ত কিতাব ও সুন্নাহর দলীলসমূহের মাঝে এই ব্যবধান পেয়েছ? কখনোই না। এক হাজার বার বলি, কখনোই পাওয়া যাবে না। বরং দলীলগুলো ব্যাপক অর্থে আক্বায়েদকেও শামিল করে। এবং আকীদার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। কারণ, এই দলীলগুলো সিন্দেহাতীত ভাবে أمر — শব্দটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা এই আয়াতে বিদ্যমানঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

“যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য নিজেদের কোনো বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার থাকে না” (আল আহযাব ৩৩:৩৬)।

এমনিভাবে “আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করার আদেশ, এবং তাঁর নাফরমানি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, তাঁর বিরোধিতা থেকে সাবধান করা এবং ঐ সকল মুমিনের প্রশংসা করা, যাদেরকে নিজেদের মামলার নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম” এই বিষয়গুলো আকীদা ও আহকামে তাঁর — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — আনুগত্য ও অনুকরণকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

“রসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তা তোমরা আঁকড়ে ধরো” (আল হাশর ৫৯:৭)।

এই আয়াতে ৮ — শব্দটি ব্যাপক ও সাধারণ অর্থবোধক একটি শব্দ, যা সকলেরই জানা। যদি তুমি আহাদ হাদীসকে আহকামের ক্ষেত্রে গ্রহণ করার পক্ষের দলীল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করবে। যেগুলো আমরা সংক্ষিপ্তকরণের স্বার্থে উল্লেখ করিনি। ইমাম শাফেঈ — রহিমাহুল্লাহ — দলীলগুলোকে পূর্ণরূপে "আর রিসালাহ" পুস্তিকায় সংকলন করেছেন। কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে পুস্তিকাটির স্মরণাপন্ন হতে পারে। তাহলে কোন বিষয়টি তাদেরকে আহাদ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আকীদা গ্রহণ না করতে বাধ্য করল। অথচ আকীদা তো আয়াতগুলোর সাধারণ অর্থের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতগুলোকে আহকামের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে তা থেকে আকীদা বাদ দেওয়াটা নিশ্চিতভাবে দলীল বিহীন নির্দিষ্টকরণ। যা সম্পূর্ণ বাতিল । আর যেই বিষয়ের কারণে বাতিল গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেটাও বাতিল ।

একটি সংশয় ও তার উত্তরঃ

তাদের মনে একটি সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পরে সেটা তাদের নিকট আকীদায় পরিণত হয়েছে। আর সেটা হল আহাদ হাদীস একমাত্র অনুমানিক তথ্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর তারা উক্ত অনুমান দ্বারা সাধারণত অগ্রাধিকারযোগ্য অনুমান উদ্দেশ্য করে থাকেন। আর আহকামের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য তথ্যের উপরে আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। তবে তাদের মতে গায়েবী বিষয়গুলোতে এবং ইলমী মাসআলাসমূহে এর উপরে আমল করা জায়েয নয়। আর আকীদা বলে মূলত এটাকেই উদ্দেশ্য করা হয়। আর যদি আমরা বিতর্কের খাতিরে তাদের এই বক্তব্য সাধারণ অর্থে মেনে নেইঃ "আহাদ হাদীস আনুমানিক অগ্রাধিকারযোগ্য তথ্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়"; তাহলে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করবঃ এই পার্থক্যবিধানের পক্ষে তোমরা দলীল কোথায় পেয়েছ? আর এই বিষয়ে তোমাদের নিকট কী দলীল আছে যে, আকীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ করা জায়েয নেই?

আমরা সমকালীন অনেক ব্যক্তিদেরকে দেখেছি এই বিষয়ে তারা মুশরিকিদের ব্যাপারে বলা আল্লাহ তা'আলার এই বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করেঃ

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ﴾

"তারা তো একমাত্র অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তির দাবি ব্যতীত অন্যকিছুর অনুসরণ করে না" (আন নাজম ৫৩:২৩) এবং আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারাঃ

﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا﴾

“নিশ্চয় ধারণাপ্রসূত জ্ঞান সত্যের বিপরীতে কোনো কাজে আসে না” (আন নাজম ৫৩:২৮)।

এই সকল আয়াত দ্বারা, যেগুলোর মাঝে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সমালোচনা করেছেন তাদের ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের অনুসরণ করার কারণে। তবে ঐ সকল দাবিদারগণ এই বিষয়টি বুঝতেই পারেননি যে, উক্ত আয়াতগুলোতে বিদ্যমান “যন্ন” শব্দটি দ্বারা অগ্রাধিকারযোগ্য জ্ঞানের কথা বলা হয়নি, যা আহাদ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যার উপরে আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন সন্দেহ, যা নিছক অনুমান মাত্র।

নিহায়া, আল লিসান ও অন্যান্য অভিধানে বলা হয়েছে: ظن – শব্দটির অর্থ হল: “এমন সন্দেহ, যা কোনো বস্তুর ব্যাপারে তোমার মনে উদয় হয়। এরপরে তুমি সেটাকে বাস্তবায়ন করে সেটার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান কর”।

এটাই সেই নিছক ধারণা, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সমালোচনা করেছেন। এই বিষয়টিকে আরো শক্তিশালীরূপে সাব্যস্ত করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার এই বক্তব্য:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾

“তারা একমাত্র ধারণা ব্যতিত আর কোনো কিছুর অনুসরণ করে না। তারা তো নিছক অনুমান ব্যতীত আর কিছুই করতে পারে না” (ইউনূস ১০:৬৬)।

সুতরাং এই আয়াতে তিনি “যন্ন” শব্দটিকে অন্ধ অনুমান অর্থে ব্যবহার করেছেন। যা নিছক কল্পনা ও অনর্থক ধারণা মাত্র।

আর যদি উক্ত আয়াতগুলোতে বিদ্যমান মুশরিকদের জন্য ব্যবহৃত “যন্ন” শব্দটি দ্বারা অগ্রাধিকারযোগ্য জ্ঞানই উদ্দেশ্য হতো – যেমনটি উক্ত দাবিদারগণ মনে করেন – তাহলে আহকামের ক্ষেত্রেও এর উপরে আমল করা জায়েয হতো না। আর সেটা হল দুইটি কারণে:

প্রথম: আল্লাহ তা‘আলা তাদের তাদের ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের ব্যাপারে নিরংকুশভাবে তাদের সমালোচনা করেছেন। আর উক্ত অনুমানকে আহকাম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আকীদার সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেননি।

সর্বশেষ: আল্লাহ তা'আলা কিছু আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন যে, যেই অনুমানের ব্যাপারে তিনি মুশরিকদের সমালোচনা করেছেন, তা আহকাম সংক্রান্ত মতকেও শামিল করে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার এই স্পষ্ট বাণীটি মনোযোগসহ শুনে দেখো:

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ﴾

"অচিরেই মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তাহলে আমরা এবং পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না (এটা আকীদার সাথে সম্পৃক্ত) এবং আমরা কোনো বস্তুকে নিজেদের ইচ্ছানুসারে হারাম করতাম না (এটা আহকামের সাথে সম্পৃক্ত)। তাদের পূর্ববর্তীরাও এভাবেই অস্বীকার করেছিল। অবশেষে তারা আমাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি আস্বাদন করল। আপনি বলুন, তোমাদের নিকট তোমাদের দাবির পক্ষে এমন কোনো দলীল আছে কি, যা তোমরা আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারবে। তোমরা একমাত্র অনুমান ব্যতীত আর কোনো কিছুরই অনুসরণ করছ না। তোমরা নিছক অর্থহীন ধারণা করছ" (আল আন'আম ৬:১৪৮) । এই আয়তটির মর্ম আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছে:

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾

"আপনি বলুন, আমার রব প্রকশ্য ও গোপনীয় সর্ব প্রকার অশ্লীল কর্ম, পাপাচার, অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা, আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের অংশীদার সাব্যস্ত করা, যেই বিষয়ে তিনি কোনো প্রতিষ্ঠিত দলীল নাযিল করেননি এবং আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে তোমাদের এমন বক্তব্য, যেই বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই" (আল আ'রাফ ৭:৩৩)।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা সাব্যস্ত হল যে, যেই "যন্ন" তথা যেই (অনুমান নির্ভর) জ্ঞানের উপরে আমল করা জায়েয নয়, তা হল আভিধানিক "যন্ন" বা অনুমান, যা নিছক কল্পনা ও অনর্থক অনুমানের সমার্থক। যা না

জেনে কথা বলার সমার্থক। আর এমন অনুমানের ভিত্তিতে আহকাম সাব্যস্ত করা হারাম। ঠিক যেভাবে আকীদা সাব্যস্ত করা হারাম। উভয়টির মাঝে কোনো তফাৎ নেই।

বিষয়টি যেহেতু এমনই, বিধায় আমাদের পূর্বোক্ত মতকে মেনে নিতেই হবে: "আহকামের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশকারী পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ ব্যাপক ও সাধারণভাবে আকীদার ক্ষেত্রেও সেটাকে গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। সত্য কথা হল, আকীদা আর আহকামের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে যেই পার্থক্য, তা মূলত ইসলামে অনুপ্রবেশকারী একটি দার্শনিক মতাদর্শ। যেই আদর্শ সম্পর্কে সালাফ ও চার ইমামের কেউই জানতেন না, যাদেরকে আধুনিক কালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ অনুসরণ করে থাকেন"।

بناؤهم عقيدة "عدم الأخذ بحديث الآحاد" على الوهم والخيال

“আকীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না’ তাদের এই আকীদাটি নিছক অনুমান ও কল্পনা নির্ভর:

আজকের দিনে একজন বুদ্ধিমান মুসলিম ব্যক্তির নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যকর কথা হল, এই কথাটি, যা খতীব ও লেখকগণ বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করেন যখনি কোনো হাদীসকে সত্যায়নের ব্যাপারে তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি যদিও হাদীসটি আহলুল ইলম এর নিকট মুতাওয়াতির হয়ে থাকে। যেমন শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ। কারণ, তারা তাদের এই বক্তব্যের পেছনে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে: “আহাদ হাদীস এর দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হয় না”। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, তাদের এই বক্তব্যটি একটি স্বতন্ত্র আকীদা। যেমনটি আমি এই মাসআলায় মুনাযারা করেছি এমন জনৈক ব্যক্তিকে বলেছি। আর এই নীতির ভিত্তিতে, তাদের জন্য জরূরী হল, এই মতের সঠিকতার পক্ষে অকাট্য দলীল উপস্থাপন করা। অন্যথায় তারা এই বিষয়ে পারস্পরিক বৈপরীত্যের মাঝে অবস্থান করছে। এটা অসম্ভব, অসম্ভব। কারণ তাদের নিকট শুধুমাত্র দাবি ছাড়া অন্যকোনো দলীল নেই। আর এমনটি আহকামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তাহলে আকীদার ক্ষেত্রে কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয়? অন্যভাবে বললে: “তারা আকীদার মাঝে গ্রহণযোগ্য আনুমানিক তথ্যকে বাদ দিয়ে এর চেয়েও নিকৃষ্ট অগ্রহণযোগ্য আনুমানিক তথ্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾

“সুতরাং তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়” (আল হাশর ৫৯: ২)।

আর এর পিছনের মূল কারণ হল, একমাত্র কিতাব ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা থেকে দূরে থাকা, উভয়টির আলো দ্বারা সরাসরি হেদায়েতের পথে চলা থেকে বিরত থাকা এবং ব্যক্তি মতের উপরে ভিত্তি করে উভয়টির আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা।

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة

আকীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস এর উপরে আমল করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষের দলীলসমূহঃ

আকীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস এর উপরে আমল করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত দলীলসমূহের তুলনায় অধিক নির্দিষ্ট আরো অনেক দলীল রয়েছে। আমি মনে করি, সেই দলীলসমূহের আংশিক এখানে এবং সেগুলোর মর্মার্থের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা জরূরী।

প্রথম দলীলঃ আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾

“মুমিনদের জন্য সকলের একসঙ্গে যুদ্ধে বের হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল কেনো দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রস্থান করে না। যাতে তারা (জ্ঞান অর্জনকারীগণ) তাদের সম্প্রদয়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা (যুদ্ধে গমনকারীগণ) তাদের নিকট (লোকালয়ে) ফিরে আসে। যাতে করে তারা (গুনাহ থেকে) সাবধান থাকে” (আত তাওবাহ ৯:১২২)।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে উৎসাহিত করেছেন এই মর্মে যে, তাদের মধ্য থেকে একটি দল যেনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গমন করে তাঁর থেকে তাদের দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং উক্ত বিষয়ে পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বিষয়টি (দীন সম্পর্কিত ফিকহ) শুধুমাত্র শাখাগত ও আহকাম (বিধি-বিধান) কেন্দ্রিক জ্ঞানের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। বরং এটা এর চেয়েও ব্যাপক। বরং এটা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু দ্বারাই পাঠ আরম্ভ করবে। এরপরে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু দ্বারা। শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করা উভয় ক্ষেত্রেই। এই বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আকীদা আহকাম থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কারণে একদল দাবি করে যে, আকীদা আহাদ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। তাদের এই মতকে এই আয়াতটি বাতিল সাব্যস্ত করে। বিধায় আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে একটি দলকে আকীদা ও আহকামের জ্ঞান ও পারদর্শিতা

অর্জনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে উৎসাহিত করেছেন। একইভাবে তাদেরকে তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের অর্জিত আকীদা ও আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে ভীতিপ্রদর্শনের ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যখন তারা তাদের নিকট (লোকালয়ে) ফিরে আসে।

طائفة — শব্দটি আরবী ভাষায় এক ও ততোধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যদি আহাদ হাদীস আকীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ না হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা একটি তায়িফাকে তাবলীগের ব্যাপারে সাধারণভাবে স্পষ্টভাষায় এই কারণ ব্যাখ্যা করে উৎসাহিত করতেন না:

﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

"যাতে করে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে"। যে ইলম মাত্র একটি তায়িফার (চাই তায়িফার সংখ্যা এক বা ততোধিক হোক) সতর্ক করণের দ্বারাই অর্জিত হয়। কারণ, এটা আল্লাহ তা'আলার শারঈ ও জাগতিক নিদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের অনুরূপ:

{لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} {لعلهم يعقلون} {لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ}

"যাতে করে তারা গবেষণা করে", "যাতে করে তারা চিন্তা করে", "যাতে করে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়"।

সুতরাং এই আয়াতটি আহাদ হাদীস আকীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট দলীল।

দ্বিতীয় দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾

"সেই বিষয়ের অনুকুরণ করবেন না, যেই বিষয় আপনি জানে না" (আল ইসরা ১৭:৩৬)

অর্থাৎ এমন বিষয়ের অনুসরণ করবেন না, এমন বিষয়ের উপরে আমল করবেন না। আর এটা জানা বিষয় যে, মুসলিমগণ সাহাবাদের যুগ থেকেই আহাদ হাদীস এর অনুসরণ করে আসছেন, সেই অনুসারে আমল করে আসছেন। সেগুলো দ্বারা গায়েবী বিষয়াদি, আকীদা সম্পর্কিত আসল বিষয়গুলো সাব্যস্ত করে আসছেন। যেমন, সৃষ্টির শুরু ও কিয়ামতের

আলামতসমূহ। বরং তারা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ পর্যন্ত সাব্যস্ত করেন। সুতরাং যদি আহাদ হাদীস ইলমকে সাব্যস্ত না করে, আকীদা সাব্যস্ত না করে, তাহলে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন এবং ইসলামের ইমামগণ সকলেই এমন বিষয়ের অনুকরণ করেছেন, যেই বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহ – (মুখতাসারুস সাওয়াঈক্ব গ্রন্থে ২/৩৯৬) বলেছেন, এটা এমন একটি কথা, যা কোনো মুসলিম বলতে পারে না।

তৃতীয় দলীলঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক্ব ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে সেটা ভালোভাবে যাচাই করে দেখো" (আল হুজুরাত ৪৯: ৬)।

অন্য ক্বিরাত অনুসারে "فتثبتوا" অর্থাৎ "নিশ্চিতভাবে জেনে নাও" । এই আয়াতটি এই বিষয়ের ইঙ্গিত করছে যে, যখন কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তখন উক্ত সংবাদ দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং উক্ত বিষয় যাচাই করা ওয়াজিব হয় না। বরং তাৎক্ষণিকভাবেই সেটাকে গ্রহণ করতে হবে। এই জন্যে ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – (আল ইলাম গ্রন্থে ২/৩৯৪) বলেছেনঃ

"এই বিষয়টি এই দিকেই ইঙ্গিত করছে যে, আহাদ হাদীস গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক এবং এই ক্ষেত্রে কোনো যাচাইয়ের দরকার নেই। যদি একজনের সংবাদ ইলম সাব্যস্ত নাই করত, তবে তিনি যাচাইয়ের আদেশ দিতেন ইলম সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতকারী আরো একটি প্রমাণ হল, সালাফ ও মুসলিম ইমামগণ চিরকাল এই কথা বলে আসছেনঃ "আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি বলেছেন, এমনটি করেছেন, এমন বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং এমন বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। আর এটা তাদের কথার মাঝে অনিবার্যভাবেই জানা যায়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছেঃ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এমন কথা অনেকগুলো স্থানে। এবং সাহাবাদের অনেকগুলো হাদীসে তাদেরই কোনো একজন বলেনঃ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অথচ তিনি অন্য আরেকজন সাহাবীর মুখ থেকে তা শুনেছেন। আর এটাই

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এমন কথা বা কাজের ব্যাপারে বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য বা দৃঢ় বক্তব্য। সুতরাং আহাদ হাদীস ইলম সাব্যস্তকারী না হলে তিনি হতেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে না জেনে সাক্ষ্য দানকারী"।

الدليل الرابع: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد

চতুর্থ দলীল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাহ দ্বারা আহাদ হাদীস এর উপরে আমল করার প্রতি নির্দেশনা পাওয়া যায়।

কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত সুন্নাহ, যেই পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে চলেছেন, সেটাতেও আকীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস এর মধ্যে কোনো বিভাজন না করার পক্ষে অকাট্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। এটা উভয়টির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই একটি প্রতিষ্ঠিত দলীল এই নির্দেশনাও পাওয়া যায়। আমি এই বিষয়ে যেসকল সহীহ হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়েছি, তার কীয়দাংশ আল্লাহর অনুমতিক্রমে এখনি বর্ণনা করতে যাচ্ছি:

ইমাম বুখারী – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – সহীহ বুখারীতে এই মর্মে শিরোনাম উল্লেখ করেছেন:

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: من الآية١٢٢] ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: من الآية٩] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: من الآية ٦] وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة

"পরিচ্ছেদ: আযান, সালাত, সিয়াম, ফারায়েয ও আহকামের ক্ষেত্রে একজন সত্যবাদী রাবীর সংবাদের স্বীকৃতি প্রদান সম্পর্কে এবং আল্লাহ তা'আলার এই বাণী সম্পর্কে যা এসেছে:

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾

"মুমিনদের জন্য সকলের একসঙ্গে যুদ্ধে বের হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল কেনো দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রস্থান করে না, যাতে তারা (জ্ঞান অর্জনকারীগণ) তাদের সম্প্রদয়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা (যুদ্ধে গমনকারীগণ) তাদের নিকট (লোকালয়ে) ফিরে আসে। যাতে করে তারা (গুনাহ থেকে) সাবধান থাকে" (আত তাওবাহ ৯:১২২)।

একজন ব্যক্তিকেও তায়িফাহ বলা হয়। দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ﴾

"যদি মুমিনদের দুইটি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়" (আল হুজুরাত ৪৯:৯)।

বিধায় যদি দুইজন ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তথাপি তারা এই আয়াতের প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। আরেকটি দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾

"যদি একজন ফাসিক্ব ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও" (আল হুজুরাত ৪৯:৬)।

আর কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আমীরদেরকে ধারাবাহিক একের পর এক প্রেরণ করেছেন। যদি তাদের কেউ ভুলে যেতেন, তাহলে তাকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনা হতো"। বুখারী হা/৭২৪৬ হাদীসের অধ্যায়।

এরপরে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আহাদ হাদীস এর স্বীকৃতির স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আহাদ হাদীস এর উপরে আমল করা জায়েয হওয়া এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত দলীল হিসেবে মৌখিক সম্মতি দেওয়া। আমি সেগুলোর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম: মালিক ইবনুল হুওয়াইরিছ রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ. وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا: وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম তখন আমরা প্রায় সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করলাম। আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ালু ও স্নেহশীল। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাচ্ছি, অথবা (তিনি এভাবে বলেছেন) আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম, তখন তিনি আমাদেরকে আমাদের পেছনে রেখে আসা ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁকে তাদের ব্যাপারে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও। তাদের মাঝে অবস্থান করো। তাদেরকে শিক্ষা দাও। তাদেরকে (সৎ কাজের) আদেশ প্রদান করো। এবং আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে সালাত আদায় করো"। বুখারী হা/৭২৪৬

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত যুবকদের প্রত্যেককে আদেশ দিলেন প্রত্যেকে যেনো স্বীয় পরিবারকে শিক্ষা দেয়। আর শিক্ষা শব্দটি আকীদাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। বরং এটা তো শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর মাঝে সর্বাগ্রে অবস্থিত। সুতরাং আহাদ হাদীস এর দ্বারা যদি দলীল সাব্যস্ত না হয়, তাহলে এমন আদেশের কোনো অর্থই থাকে না।

দ্বিতীয়: আনাস বিন মালিক রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: "هذا أمين هذه الأمة" أخرجه مسلم "٧/٢٩" ورواه البخاري مختصرا

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা ইয়েমেনবাসী এসে বলল: আমাদের সঙ্গে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি আমাদেরকে সুন্নাহ ও ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি বলেন: তখন তিনি আবূ উবায়দাহ এর হাত ধরে বললেন: এই ব্যক্তি হল এই উম্মার

আমীন। সহীহ মুসলিম (৭/২৯), ইমাম বুখারী হাদীসটি সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করেছেন।

আমি বলব: যদি আহাদ হাদীস দ্বারা দলীল সাব্যস্ত না হতো, তাহলে তিনি আবূ উবায়দাকে একাকী তাদের নিকট পাঠাতেন না। এমনিভাবে তাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে পালাক্রমে বিভিন্ন বার অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাকে ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাগণকে প্রেরণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। যেমন, আলী ইবনু আবী তালিব, মুআয বিন জাবাল, আবূ মূসা আল আশআরী রদ্বীয়াল্লাহ আনহুম। এবং তাদের হাদীসগুলোর ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়, যেগুলো সহীহাইন ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর যেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তা হল তাদেরকে যাদের নিকট প্রেরণ করা হতো, তাদেরকে তারা যা শিক্ষা দিতেন তার মাঝে আকীদাও সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতো। সুতরাং যদি তাদের দ্বারা তাদের উপরে দলীল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিশ্চয় এককভাবে পাঠাতেন না। কারণ, এটা হতো, একটি অনর্থক কাজ, যা থেকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ পবিত্র। আর এটাই হল ইমাম শাফেঈ – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – এর আর রিসালাহ গ্রন্থে (৪১২ নং পৃষ্ঠা) বর্ণিত এই বক্তব্যের মর্মার্থ:

"তিনি – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – স্বীয় নির্দেশ সহকারে কখনোই কাউকে প্রেরণ করবেন না, যদি না আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তার সংবাদটি (সংশ্লিষ্ট একক ব্যক্তি থেকে) গ্রহণ করার পক্ষে প্রেরিত ব্যক্তিদের জন্য এবং প্রেরিত ব্যক্তিদের উপরে বাধ্যতামূলক কোনো প্রতিষ্ঠিত দলীল থাকে। অথচ তিনি তাদের নিকট স্বীয় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে, অথবা তাদের নিকট একাধিক সংখ্যক ব্যক্তিদেরকে তাদের নিকট প্রেরণ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনি মাত্র এমন একজনকেই পাঠিয়েছেন, যাকে তারা সত বলে জানে।

তৃতীয় দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم

"একদা মানুষজন ফজরের সালাত আদায়রত অবস্থায় তাদের নিকট জনৈক আগন্তুক এসে বলল: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আজ রাত্রে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরাও কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তখন তাদের মুখ ছিল শাম অভিমুখে। তখনি তারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন"। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এটা এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট দলীল যে, সাহাবীগণ – রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম – অকাট্যরূপে সাব্যস্ত হওয়া বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করার ওয়াজিব বিধানকে রহিত করার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা একজনের সংবাদের ভিত্তিতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে পরিত্যাগ করে কা'বাকে ক্বিবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাদের নিকট যদি আহাদ হাদীস প্রতিষ্ঠিত দলীল না হতো, তাহলে তারা এর ভিত্তিতে তাদের নিকট বিদ্যমান অকাট্যরূপে সাব্যস্ত প্রথম ক্বিবলার বিপক্ষে অবস্থান নিতেন না।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই আচরণকে অপছন্দ করেননি। বরং তাদের এই কর্মের কারণে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

চতুর্থ দলীল: "সাঈদ বিন জুবাইর রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى نبي إسرائيل فقال ابن عباس: كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر.

أخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا وقال "١٢١٩/٤٤٢"

আমি ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাকে বললাম: নাওফ আল বাকালী দাবি করতেন যে, খিযির আলাইহিস সালাম এর সঙ্গী মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত মূসা ছিলেন না। তখন ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বললেন: আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছেন। আমাকে উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের নিকট আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য পেশ করলেন। এরপরে মূসা আলাইহিস সালাম ও খিযির আলাইহিস সালাম এর ঘটনা আলোচনা করলেন এমন কথায়, যা

স্বয়ং মূসা আলাইহিস সালাম খিযির আলাইহিস সালাম এর সঙ্গী ছিলেন এই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে"।

শায়খাইন হাদীসটি বিস্তারির বর্ণনা করেছেন। আর শাফেঈ সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন (৪৪২/১২১৯):

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ আহাদ হাদীস দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত করছেন:

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر

"সুতরাং ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা ফকীহ ও পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত উবাই বিন কা'ব রদ্বীয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসকে তিনি প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করছেন, একজন মুসলিম ব্যক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য। যেহেতু তাকে উবাই বিন কাব রদ্বীয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত মূসাই খিযির আলাইহিস সালাম এর সঙ্গী ছিলেন বলে নির্দেশনা পাওয়া যায়" ।

আমি (ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ) বলব: ইমাম শাফেঈ – রহিমাহুল্লাহ – এর এই বক্তব্যটি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল যে, তিনি আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করতেন না। কারণ, মূসা আলাইহিস সালাম এর খিযির আলাইহিস সালাম এর সঙ্গী হওয়ার বিষয়টি একটি ইলমী মাসআলা। যা কোনো আমলী বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এই দাবিটিকে আরো অধিক সঠিকভাবে সাব্যস্ত করে এই বিষয়টি যে, ইমাম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – আর রিসালাহ গ্রন্থে "আহাদ হাদীস সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দলীল" শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন। এই শিরোনামের অধীনে (৪০১-৪৫৩ নং পৃষ্ঠা) তিনি কিতাব ও সুন্নাহ থেকে অনেকগুলো দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেগুলো মুতলাক বা আম পর্যায়ের দলীল। যেই দলীলগুলো সাধারণভাবে ও ব্যাপক অর্থে এই বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যে, আহাদ হাদীস আকীদার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত দলীল। এমনিভাবে সেগুলোর ব্যাপারে তার বক্তব্যও সম্পূর্ণ আম। এই তিনি এই বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনাটির পরিসমাপ্তি টেনেছেন:

وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه١ السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكى لنا عنه أن أهل العلم بالبلدان

"আহাদ হাদীস সাব্যস্ত করণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো হাদীস আছে, যেগুলোর মাঝে এটাকে আঁকড়ে ধরাই যথেষ্ট হবে। আমাদের সালাফগণ ও তাদের পরবর্তী যুগের লোকগণ থেকে শুরু করে আমাদের দেখা এই যুগ পর্যন্ত লোকগণ এখনো এই রাস্তার উপরেই অবিচল আছেন। এমনিভাবে আমাদের নিকট যেসকল আলেমের তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারেও আমাদের নিকট একই মতাদর্শের কথা বর্ণিত হয়েছে"। এটাও একটি আম বক্তব্য।

একইভাবে (৪৫৭ নং পৃষ্ঠা) তার এই বক্তব্য:

"ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد"

"যদি কোনো মানুষের পক্ষে ইলমুল খাসসাহ (ফিকহ এর শাখাগত বিধান সম্পর্কিত শাস্ত্র) শাস্ত্রে এই কথা বলা জায়েয হয়: অতীত ও বর্তমানের সকল মুসলিমগণ আহাদ হাদীস সাব্যস্ত করণ এবং এটা তাঁর – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – পর্যন্ত পৌঁছানোর বিষয়ে একমত হয়েছেন। যেহেতু মুসলিম ফকীহগণ এর প্রত্যেকেই এটাকে সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে তা আমার জন্যই জায়েয হবে বলে মনে করি। তথাপি আমি কথাটা এভাবে বলব: "মুসলিম ফকীহগণ থেকে আমি এমন কোনো মত আমার স্মৃতিতে নেই যে, তারা আহাদ হাদীস সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য করেছেন"।

عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة

আকীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ না করা একটি নবপ্রবর্তিত বিদআত:

মোটকথা: কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ, সাহাবীগণের আমল ও আলেমগণের বক্তব্যসমূহ – আমাদের পূর্ববর্তী বিশ্লেষণের উপরে – অর্থাৎ শরীআতের প্রত্যেকটি শাখায় আহাদ পর্যায়ের হাদীসগুলো গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার উপরে অকাট্যরূপে নির্দেশ করে। চাই হাদীসটি আকীদা বিষয়ক হোক অথবা আমল বিষয়ক হোক। আর উভয়টির মাঝে পার্থক্য বিধান করা একটি বিদআত, যা সালাফগণের নিকট অপরিচিত ছিল।

এই জন্যই আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – (৩/৪১২) বলেছেন:

“এই পার্থক্য বিধান উম্মার সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। কারণ, এই জাতীয় হাদীসগুলো দ্বারা চিরকাল যাবৎ ইলমী সংবাদসমূহের (অর্থাৎ আকীদা) ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। যেভাবে এগুলো দ্বারা আমলী দাবিসমূহের ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশ করা হয়। বিশেষত, আমলী বিধানগুলো আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এই সংবাদ অবশ্যই ধারণ করে যে, তিনি এই বিধান প্রণয়ন করেছেন এবং এটাকে তিনি ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাকে দীন হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাঁর দীন ও তাঁর প্রণীত বিধান তাঁর নামসমূহ ও গুণসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন এবং আহলুল হাদীস ওয়াস সুন্নাহ সম্প্রদায় এই জাতীয় সংবাদসমূহ দ্বারা সিফাতসমূহ, তাক্বদীর, নামসমূহ ও বিধানসমূহের যাবতীয় মাসআলায় চিরকাল দলীল পেশ করে আসছেন। তাদের কারোর থেকেই এটা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি এমন হাদীসগুলো দ্বারা শুধুমাত্র বিধিবিধানের ক্ষেত্রেই দলীল পেশ করাকে জায়েয বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কিত, তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর ছিফাতগুলোর ব্যাপারে জায়েয বলেননি। তাহলে এই দুই অধ্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারীদের সালাফ কোথায় গেল?! হ্যা, তাদের সালাফ হল, কিছু পরবর্তী যুগের মুতাকাল্লিম আলেমগণ, যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত সুন্নাতের ব্যাপারে কোনো মনোযোগ রাখে না। বরং তারা শরীআতের এই শাখায় বিদ্যমান কিতাব, সুন্নাহ ও সাহাবীদের মতামত এর মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া থেকে মানুষদের অন্তরসমূহকে বাঁধা দেয়। তারা বিকল্প হিসেবে কালাম শাস্ত্রবিদদের

মতামত, লৌকিকতাকারীদের নীতিমালার আশ্রয় নেই। তাদের থেকেই এই দুইটি শাখায় পার্থক্ত বিধানের বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তারা এই পার্থক্য বিধানের উপরে ইজমা এর দাবিও করেছে। তারা যেটাকে ইজমা বলে দাবি করেছে, তা আদতে একজন মুসলিম ইমাম থেকেও সাব্যস্ত হয় না। কোনো সাহাবী থেকেও হয় না। কোনো তাবেঈ থেকেও হয় না।

বিধায়, আমরা তাদের নিকট আহাদ হাদীস দ্বারা দীনের কোন বিষয় সাব্যস্ত করা জায়েয আর কোন বিষয় সাব্যস্ত করা জায়েয নয়, তা জানতে চাইলে তারা একমাত্র বাতিল দাবিসমূহ ছাড়া এই বিষয়ে পার্থক্য করার অন্যকোনো উপায় খুঁজে পায় না। যেমন তাদের ইনেকে বলেঃ মৌলিক বিষয়বস্তুগুলোই হল ইলমী মাসআলা। আর শাখাগত বিধানগুলোই হল আমলী মাসআলা। (অথচ এটাও একটি বাতিল পার্থক্য) ।

কারণ, আমলীয়াতের বিষয়বস্তু দুইটিঃ ইলম ও আমল। আর ইলমীয়াতের বিষয়বস্তুর মাঝেও ইলম ও আমল দুইটিই বিদ্যমান। আর তা হলঃ অন্তরের ভালোবাসা ও ঘৃণা। ইলমী বিষয়গুলোর নির্দেশিত ও ধারণকৃত হক এর ব্যাপারে ভালোবাসা। আর ঐ বাতিল বিষয়কে ঘৃণা করা, যা সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং এখানে আমল শুধুমাত্র শারীরিক আমলের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। বরং অন্তরের আমলগুলো শারীরিক আমলগুলোর মৌলিক উৎস। আর শারীরিক আমলগুলো এর অনুগামী। তাই প্রতিটি ইলমী মাসআলার অধীনে অন্তরের ঈমান, সত্যায়ন ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকবে। আর এটাই হল আমল। বরং এটাই প্রকৃত আমল। আর এখানেই ঈমানের বিষয়টিতে অনেক মুতাকাল্লিমগণ ত্রুটির শিকার হয়েছেন। তারা মনে করেছেন যে, ঈমান হল শুধুমাত্র সত্যায়নের নাম, আমলের নাম নয়। আর এটাই হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য একটি ভুল। কারণ, অনেক কাফেরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। তারা কোনো সন্দেহ পোষণ করত না। তবে তাদের এই সত্যায়নের সাথে অন্তরের আমল সংযুক্ত হয়নি। আর তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দীনের ব্যাপারে ভালোবাসা, সন্তুষ্টি, তা মানার অভিপ্রায় এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক নির্ধারণ। বিধায় তুমি এই বিষয়টিকে মোটেও অবহেলা করো না। কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর দ্বারাই তুমি ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।

সুতরাং ইলমী (জ্ঞান সংক্রান্ত) মাসআলাগুলোও এক প্রকার আমলী (কর্ম সংক্রান্ত) মাসআলা। আবার আমলী মাসআলাগুলোও এক প্রকার ইলমী মাসআলা। যেহেতু শরীআত প্রণেতা আমলী মাসআলাগুলোতে দায়িত্বশীল

বান্দাদেরকে ইলম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমল করার উপরেই ক্ষান্ত করেননি। আর ইলমী মাসআলাগুলোতে আমল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইলমের উপরে ক্ষান্ত করেননি"। (শেষ)

সুতরাং ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – এর আলোচনা থেকে এটা স্থির হল যে, উল্লিখিত পার্থক্য বিধানটি সর্ব সম্মতিক্রমে বাতিল হওয়া, তা সালাফদের কর্মপদ্ধতির বিরোধী হওয়ার কারণে এবং পূর্ববর্তী দলীলসমূহ স্পষ্টরূপে এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তা সম্পূর্ণ বাতিল। তা ছাড়াও এটা পার্থক্য বিধানকারীদের ইলমকে আমলের সাথে এবং আমলকে ইলমের সাথে সংযুক্ত থাকার বিষয়টিকে ওয়াজিব মনে না করার ধারণার কারণেও তা বাতিল। আর এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। যা মুমিনকে ঈমানের বিষয়বস্তু বুঝতে অত্যন্ত উত্তমরূপে সাহায্য করবে। আর উল্লিখিত পার্থক্য বিধানের দৃষ্টিতে ঈমান নিশ্চিতভাবেই বাতিল হওয়ার দ্বার প্রান্তে থাকে।

إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين

অনেক আহাদ হাদীস ইলম ও ইয়াকীন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেঃ

উল্লিখিত পার্থক্য বিধানের মতকে বাতিল আখ্যা দেওয়ার পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ ও আলোচনাটি সম্পূর্ণরূপে আহাদ হাদীস একমাত্র গ্রহণযোগ্য জ্ঞান সাব্যস্ত করতে পারে এই মতটিকে সঠিক মেনে নেয়ার উপরে নির্ভরশীল। আহাদ হাদীস ইয়াকীন বা অকাট্য ইলমকে সাব্যস্ত করতে পারে এই মতের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং এই বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার যে, এটা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত নয়। বরং এই বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন যেই বিষয়টি উল্লেখ করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আহাদ হাদীস অনেক ক্ষেত্রেই ইলম ও ইয়াকীনকে সাব্যস্ত করতে পারে। এর মধ্যে এমন সমূহ হাদীসও আছে, যেগুলো উম্মাহ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে। এগুলোর মাঝে অন্যতম হল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মুত্তাফাক্ব আলাইহি হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিমের সমালোচনা বহির্ভূত হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু হাদীসটি অকাট্যরূপে সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে। আর তত্ত্বগত চূড়ান্ত পর্যায়ের নিশ্চিত ইলমও এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যেমনটি ইমাম ইবনুস সালাহ তার গ্রন্থে (উলূমুল হাদীস) (২৮-২৯ নং পৃষ্ঠা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আর হাফেয ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ তার

"মুখতাসার" গ্রন্থে তার মতটিকে আরো শক্তিশালী করেছেন এবং তার পূর্বে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহও তাই করেছেন। আর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীয়াহ "মুখতাসারুস সাওয়াঈক্ব গ্রন্থে (২/৩৮৩) তার অনুকরণ করেছেন। আর এর স্বপক্ষে কয়েকটি হাদীস দ্বারা দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেগুলোর মাঝে উমার – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – এর হাদীস: "আমলসমূহ একমাত্র নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। এই হাদীসটি: "যখন সে (স্বামী) তার (স্ত্রী) চার বাহুর মাঝে বসে পূর্ণোদ্যমে তার সঙ্গে সহবাস করবে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে"।

ইবনু উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার এই হাদীসটি: "আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বান মাসে ছোট, বড়, পুরুষ ও নারী সকলের উপরে সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন"। এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসসমূহ। ইবনুল কাইয়্যিম একই গ্রন্থে (২/৩৭৩) বলেছেন:

"শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই হাদীসটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উম্মতের সকলের নিকট নিশ্চিত ইলমকে সাব্যস্ত করে। সালাফদের মাঝে এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। আর খালফ এর বিষয়টা হল, এটা আসলে চার ইমামের উত্তরসূরী বড় বড় ফকীহগণের মাযহাব। আর এই মাসআলাটি হানাফী, মালিকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হানাফীদের মাঝে রয়েছেন সারাখসী ও আবূ বকর আর রাযী। আর শাফেঈদের মাঝে রয়েছেন শায়েখ আবূ হামিদ, আবূত্ব ত্বায়্যিব ও শায়েখ আবূ ইসহাক্ব। আর মালিকীদের মাঝে রয়েছেন ইবনু খুওয়াইয মানদাদ ও আরো অনেক। আর হাম্বলীদের মাঝে রয়েছেন ক্বাযী আবূ ইয়ালা, ইবনু মূসা, আবূল খাত্ত্বাব ও অন্যান্য হাম্বলী আলেমগণ। আর মুতাকাল্লিমদের মাঝে রয়েছেন আবূ ইসহাক্ব আল ইসফিরায়িনী, ইবনু ফাওরাক ও আবূ ইসহাক্ব আন নাযযাম। ইবনুস সালাহ মতটি উল্লেখ করে এটাকে সহীহ সাব্যস করেছেন এবং এটাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি এই মতের প্রবক্তাদের আধিক্যতার ব্যাপারে জানতেন না, যাদের মাধ্যমে তিনি মতটিকে শক্তিশালী করতে পারতেন। তিনি মতটি দিয়েছেন সহীহ দলীলের দাবি অনুসারে। আর তার উপরে যেসকল জ্ঞানী ও ধার্মিক মাশায়েখ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যাদের এই শাখায় পূর্ণ দক্ষতা নেই তারা ধারণা করেছেন: আবূ আমর ইবনুস সালাহ যেই মতটি দিয়েছেন, তা দ্বারা তিনি অধিকাংশ এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। আর তাদের অপারগতা হল, তারা এই মাসআলাগুলো ইবনুল হাযিব এর বক্তব্যকে তাদের উৎস মনে করেন। আর যদি তারা আরো এক

স্তর উপরে উঠেন, তাহলে তারা সাইফুদ্দীন আল আমিদী ও ইবনুল খাত্বীব পর্যন্ত উঠে যান। যদি তাদের সনদ আরো উর্ধ্বে উঠে, তাহলে তারা গাযালী, জুওয়াইনী ও বাক্বিল্লানী পর্যন্ত উঠতে পারেন। (তিনি বলেছেন): সকল আহলুল হাদীস আলেমের মত শায়েখ আবূ আমরের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর অধিকাংশের মতের বিপক্ষে দলীল হল:

সত্যায়ন ও আমলের মাধ্যমে এটাকে গ্রহণ করাটা উম্মতের সকলের পক্ষ থেকে ইজমা বলে বিবেচিত। গোটা উম্মাহ কখনো বিভ্রান্তির উপরে একমত হতে পারে না। যেমন আম অথবা মুতলাক, অথবা কোনো বস্তুর হাকীকী নাম, অথবা কিয়াস ইত্যাদির আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে যদি তারা একমত হয়ে থাকে, তাহলে তারা বিভ্রান্তির উপরে একমত হতে পারে না। কিন্তু যদি তাদের কোনো একজন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে, তাহলে তিনি ভুল থেকে নিরাপদ হতে পারবেন না। কারণ, হেদায়েতের বিশুদ্ধতা সামগ্রিক বিবেচনায় সাব্যস্ত হয়। যেভাবে মুতাওয়াতির সংবাদের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার ও ভুলের শিকার হওয়াটা রাবীদের ব্যাপারে সম্ভব হতে পারে এককভাবে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে একত্রে এটা সম্ভব নয়, অবাস্তবিক। আর গোটা উম্মাহ বর্ণনা ও রায়ের ক্ষেত্রে ভুল থেকে মুক্ত।

(তিনি বলেন): "এই অধ্যায়ে আহাদ হাদীস কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষে অগ্রাধিকারযোগ্য তথ্য হয়ে থাকে। আর যখন তা আরো শক্তিশালী হয়, তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যে রূপান্তরিত হয়। আর যখন তা দুর্বল হয়, তখন বিভ্রান্তিকর অলীক কল্পনায় পরিণত হয়"। (তিনি বলেছেন):

"জেনে রাখো, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সংখ্যাগরিষ্ঠ হাদীস এই প্রকারের হাদীস। যেমনটি শায়েখ আবূ আমর উল্লেখ করেছেন। আর এই মতকে গ্রহণকারী আলেমদের মাঝে অন্যতম হলেন, হাফেয আবূ তাহের আস সালাফী ও অন্যান্য আলেমগণ। কারণ, আহলুল হাদীস আলেমগণ যেই মতকে গ্রহণযোগ্য ও সত্যায়িত বলে গ্রহণ করেন, সেটা অবশ্যই ইলমকে সাব্যস্ত করে, ইয়াকীনকে সাব্যস্ত করে। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারী মুতাকাল্লিম ও উসূলবিদদের বিরোধিতার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। কারণ দীনের কোনো বিষয়ে ইজমা এর ক্ষেত্রে একমাত্র আহলুল ইলম এর মতেরই গ্রহণীয়তা থাকবে। এই বিষয়ে কোনো মুতাকাল্লিম, নাহুবিদ ও চিকিৎসকদের মত ধর্তব্য নয়। এমনিভাবে ইজমা এর ক্ষেত্রে হাদীস সঠিক হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারেও একমাত্র আহলুল হাদীস, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও হাদীসের সনদ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতই কেবল গ্রহণযোগ্য

হবে। আর তারা হলেন হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেমগণ। যারা তাদের নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর জীবনের অলি-গলি সম্পর্কে অবহিত। যারা তাঁর কথা ও কর্মসমূহ সুন্দরভাবে আয়ত্ব করেছেন। মুকাল্লিদগণ তাদের অনুসৃত ব্যক্তিদের মতসমূহের ব্যাপারে যতটুকু যত্নশীল তার চেয়ে তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাঁর কথা ও কর্মসমূহের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল।

সুতরাং যেভাবে মুতাওয়াতির সম্পর্কে জ্ঞান আম (ব্যাপক) ও খাস (নির্দিষ্ট) এই দুইভাগে বিভক্ত। যার ফলে কোনো বিষয় খাস ব্যক্তিদের নিকট মুতাওয়াতির হলেও সেই বিষয়ে অন্যদের জানা থাকে না, তাদের নিকট মুতাওয়াতির হওয়া তো দূরের বিষয়। ঠিক তেমনি আহলুল হাদীস আলেমগণ তাদের নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সুন্নাহ সম্পর্কে অত্যধিক যত্নশীল হওয়া, তাঁর কথা, কর্মসমূহ ও তাঁর জীবনের যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে আয়ত্ব করার কারণে তারাও উক্ত বিষয়ে এমন জ্ঞান রাখে, যেই বিষয়ে তাদের কোনো সংশয় থাকে না। যেই বিষয়ে অন্যদের কোনো ধারণাও থাকে না।

فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم

ইলম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য খবরসমূহের উপরে শারঈ খবরকে কিয়াস করার ভ্রান্তি:

ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা‘আলা – (২/৩৬৮) এর বক্তব্য:

“আহাদ হাদীস ইলম সাব্যস্ত করে না এই অস্বীকৃতি সৃষ্টি হয়েছে ভ্রান্তিকর কিয়াস থেকে। কারণ, অস্বীকারকারী আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর থেকে বর্ণিত উম্মতের জন্য প্রণীত বিধান সম্বলিত সংবাদ বর্ণনাকারী অথবা মহান আল্লাহ তা‘আলার কোনো সিফাত সম্বলিত সংবাদ বর্ণনাকারীকে নির্দিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে সাক্ষীদাতার সঙ্গে তুলনা করেছে। অথচ উভয়ের কত বড় দূরত্ব! কারণ, যদি আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সূত্রে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল না

থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়, তাহলে এর ফলে সৃষ্টিকুলের বিভ্রান্তি অনিবার্য। যেহেতু আমাদের আলোচিত বিষয় এমন সংবাদ, যা সমগ্র জাতি গ্রহণ করেছে। উক্ত সংবাদের দাবি অনুসারে আমল করেছে এবং এর দ্বারা মহান রবের সিফাত ও কর্মসমূহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ যেই সংবাদ গ্রহণ করা শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব, তা আসলে বাতিল হতে পারে না। বিশেষভাবে, যখন সমগ্র জাতি সেটাকে গ্রহণ করে নেয়। এমনিভাবে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে মান্য করা ওয়াজিব এমন প্রতিটি দলীলের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। যা প্রকৃত সত্য ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। ফলে এর মর্মটিও ভিত্তিগতভাবে সাব্যস্ত হবে। এই নীতি মহান রবের শরীআহ, তাঁর সিফাত ও তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, এমন সাক্ষ্য কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে, যার প্রকৃত দাবি বাস্তবে সাব্যস্ত হয় না"।

মাসআলাটির মূল রহস্য হল, যেই সংবাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন, এবং তাঁর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর পবিত্র মুখে উচ্চারিত তাঁর যাবতীয় নাম ও সিফাত এর পরিচয় তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, এমন সংবাদ ভিত্তিগতভাবে মিথ্যা ও বাতিল হতে পারে না। কারণ, এটা স্বীয় বান্দাদের উপরে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠিত দলীল। আর আল্লাহর দলীলসমূহ কখনো মিথ্যা ও বাতিল হতে পারে না। বরং এগুলো ভিত্তিগতভাবে একমাত্র সত্যই হবে। আর হক ও বাতিলের দলীলসমূহ কখনোই সমমানের হওয়া সম্ভব নয়। আর আল্লাহ, তাঁর দীন ও তাঁর শরীআহ এর ব্যাপারে বলা মিথ্যা সংবাদ ঐ অহীর সঙ্গে – একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না – কখনোই এমনভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে না, যা তিনি স্বীয় রসূলের উপরে নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি স্বীয় সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত করতে বাধ্য করেছেন। কারণ হক আর বাতিল, সত্য আর মিথ্যা, শয়তানের অহী আর আল্লাহর নিকট থেকে আনীত ফেরেশতার অহীর মাঝে পার্থক্য একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য থেকে অধিক সুস্পষ্ট। জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা হকের উপরে এমন একটি আলো স্থাপন করে দিয়েছেন, যা সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল। যা আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষদের সামনে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। আর বাতিলের উপরে রাতের অন্ধকারের ন্যায় একটি অন্ধকার চাদর জড়িয়ে দিয়েছেন।

এটা কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয় যে, দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির নিকট রাত্র দিবসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে। ঠিক যেভাবে অন্তর্দৃষ্টিহীন ব্যক্তির নিকট হক বাতিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। মুআয বিন জাবাল তার তার রায়ে বলেছেন: "হক এর বক্তার নিকট থেকে গ্রহণ করো, কারণ হকের সাথে নূর থাকে"। কিন্তু যখন আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হতে আগত দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দ্বারা অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়, অন্তর্দৃষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি ব্যক্তির মতসমূহের উপরে অন্তর্দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করার দ্বারা হক ও বাতিল অন্ধকারের সাথে মিশে যায়, যার ফলে সেই অন্ধকার ঐ সকল সহীহ হাদীসের ব্যাপারেও মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যেগুলো উম্মার সবচেয়ে সত্যবাদী ও সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক বর্ণিত। আর ঐ সকল বাতিল মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস সত্য হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যেগুলো তাদের প্রবৃত্তির সাথে সহমতপূর্ণ হয়। আর এমন হাদীসসমূহের দ্বারাই তারা দলীল পেশ করে।

وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم؟ وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل

আর কালাম শাস্ত্রবিদগণ জালেম ও জাহেল। তারা সিদ্দীক, ফারূক ও উবাই বিন কা'ব এর সংবাদকে সাধারণ মানুষের একক সংবাদগুলোর সঙ্গে তুলনা করে। অথচ উভয় প্রকারের সংবাদের মাঝে ব্যবধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাহলে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালেম কে হতে পারে, যে সাহাবীগণের একক সংবাদ ও সাধারণ মানুষের একক সংবাদ এর মাঝে উভয়টিই ইলমকে সাব্যস্ত করে না মর্মে কোনো পার্থক্য বিধান করে না? আর এমন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মতোই, যে তাদের মাঝে ইলম, দীন ও মর্যাদার মাঝে কোনো ব্যবধান স্বীকার করে না। তিনি (২/৩৭৯) বলেছেন:

سبب ادعائهم "عدم إفادة حديث الآحاد العلم" هو جهلهم بالسنة

আহাদ হাদীস ইলমকে সাব্যস্ত করে না এই দাবির মূল কারণ সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা:

যখন তারা বলে: নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংবাদ ও তাঁর সহীহ হাদীসসমূহ ইলমকে সাব্যস্ত করে না, তখন তারা আসলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে এই তথ্যই প্রদান করছে যে, তারা এই হাদীসগুলো থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা নিজেদের ব্যাপারে যেই তথ্য দিচ্ছে, তা সত্য। কিন্তু এমন হাদীসসমূহ আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীস আলেমদের জন্য ইলম সাব্যস্ত করে না তাদের এই তথ্যটি মিথ্যা। তিনি (২/৪৩২) বলেছেন: যেহেতু আহলুসস সুন্নাহ যেই পন্থায় এগুলো থেকে ইলম অর্জন করেছেন, সেই পন্থাগুলো তাদের হস্তগত হয়নি, তাই ইলমও তাদের অর্জিত হয়নি। সুতরাং তাদের এই বক্তব্য: "আমরা এগুলো থেকে কোনো ইলম অর্জন করিনি" এর দ্বারা বিষয়টিকে সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। এটা ঠিক এমন, যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ব্যক্তি উক্ত বস্তু সম্পর্কে জানে আর যে উক্ত বস্তুটি খুঁজে পায়নি, সে সেই বিষয়ে জানে না তারা এক নয়। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের মনে ব্যথা, অথবা আনন্দ, অথবা ভালোবাসা, অথবা গোস্বা অনুভব করে, আর সে নিজের স্থলে ঐ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে, যে এই ব্যাপারে দলীল পেশ করবে যে, সে ব্যথিত নয়, মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত নয়, সে ভালোবাসা এবং গোস্বা অনুভব করে না। আর তাকে সে (প্রথম ব্যক্তি) বারংবার সন্দেহ উস্কে দেয়, যার সর্বশেষ অবস্থা হল, তুমি যা পেয়েছে, আমি তা পাইনি। যদি বিষয়টি সত্যি সত্যি অস্তিত্বশীল হতো, তাহলে আমি আর তুমি উভয়েই তা খুঁজে পেতাম। অথচ এটা নিশ্চিত বাতিল। এই কথাটি কতইনা সুন্দর:

"নিন্দা উপহার দানকারী নিন্দুককে আমি বলি : তুমি অনুরাগ-আবেগের স্বাদ আস্বাদন করো। এরপরে যদি নিন্দা করতে পার, তাহলে করো" ।

সুতরাং তাকেও বলা হবে: "তুমি নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – থেকে আগত সংবাদের দিকে মনোনিবেশ করো, সেই বিষয়ে আগ্রহী হও, গবেষণা করো এবং সংকলন করো। সেই সংবাদের বর্ণনাকারীদের জীবন ও তাদের চরিত্র ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করো। অন্যসকল বিষয় থেকে বের হয়ে আসো। সেটাকেই তোমার চূড়ান্ত গন্তব্য, সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পরিণত করো। বরং মাযহাবের অনুসারীগণের মাঝে তাদের ইমামদের মাযহাব সম্পর্কে

জানার যেই আগ্রহ আছে, এই বিষয়ে তুমিও তেমনি আগ্রহী হও। যেভাবে তাদের নিকট এটা একটি অনিবার্য ইলমে রূপান্তরিত হয়েছে যে, এগুলো তাদের মাযহাব ও তাদের বক্তব্য। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি তাদের নিকট এটা অস্বীকার করে, তাহলে তাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আর তখনি তুমি জানতে পারবে যে, আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সংবাদসমূহ ইলমকে সাব্যস্ত করে না-কি করে না? তবে এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে এবং এগুলো অনুসন্ধান না করলে তুমি সেখান থেকে কোনো ইলম পাবে না। আর যদি তুমি বল: এই হাদীসগুলো তোমার নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য তথ্যও সাব্যস্ত করতে পারে না, তাহলে তুমি হাদীসগুলোতে তোমার অংশ ও ভাগ কতটুকু আছে, শুধুমাত্র তাই তুমি প্রকাশ করলে!" ।

مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة

হাদীসের ব্যাপারে কিছু ফকীহর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার দু'টি দৃষ্টান্ত:

আমি বলব: এটা এমন একটি বাস্তবতা, যা হাদীস শাস্ত্রের গবেষক, হাদীসের শব্দ ও সনদের পর্যবেক্ষক এবং কিছু সংখ্যক বর্ণনার ব্যাপারে কিছু ফকীহগণের অবস্থান সম্পর্কে অবগত প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করেন। আমি এই বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি: যার একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক:

প্রথম উদাহরণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

"যে ব্যক্তি সালাতে ফাতিহা সূরা পাঠ করেনি, তার সালাত হয়নি"। এটা সহীহাইনে (সহীহ বুখারী হা/৭৫৬, সহীহ মুসলিম হা/৩৯৪) বর্ণিত একটি সহীহ হাদীস হওয়ার পরেও হানাফীগণ এই দাবির ভিত্তিতে এটাকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, এটা কুরআনের বাহ্যিক মর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। আর তা হল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾

"তোমাদের জন্য সহজ হয় এমন যেকোনো স্থান হতেই পাঠ করো" (আল মুযযাম্মিল ৭৩:২০)।

এরপরে তারা হাদীসটির তাবীল করেছে এই জন্য যে, হাদীসটি তাদের ধারণামতে, একটি আহাদ পর্যায়ের হাদীস। অথচ আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীস ইমাম বুখারী তার গ্রন্থ "জুযউল ক্বিরাআত" এ স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, এটা আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – থেকে বর্ণিত একটি মুতাওয়াতির হাদীস।

তোমার কী মনে হয়, ঐ সকল ব্যক্তির উপরে কি ওয়াজিব ছিল না যে, তারা এমন মহান হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমামের ইলম থেকে জ্ঞান অর্জন করবে এবং এটা আহাদ হাদীস এই বিষয়ে তাদের রায়কে পরিবর্তন করে ফেলবে এবং হাদীসটিকে আয়াতটির সাথে সংযুক্ত করে সেটার দ্বারা আয়াতটিকে নির্দিষ্ট করবে? অথচ উপর্যুক্ত আয়াতটি সালাতুল লাইল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সালাতে ফরযকৃত ক্বিরাআত এর বিষয়ে নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ: শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ সম্পর্কিত হাদীস। যা সহীহাইনেও বর্ণিত হয়েছে। আযহারের শায়েখগণকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাদের কোনো একজন "আর রিসালাহ" পত্রিকায় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: এটা হাদিসুল আহাদ। আর হাদীসটির সনদের মূল ভিত্তি হল ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ এবং কা'ব আহবার।

অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর হাদীসটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এটা মুতাওয়াতির হাদীস। আর আমিও ব্যক্তিগতভাবে হাদীসটির সাথে সম্পর্কিত সনদসমূহ নিয়ে গবেষণা করে দেখেছি যে, হাদীসটি নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – থেকে প্রায় চল্লিশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর মাঝে বিশটি সনদ কমপক্ষে সহীহ পর্যায়ের। আর কিছু কিছু সনদ অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিসগণ একাধিক সহীহ সনদে "সহীহাইনে" এবং "সুনানে" এবং "মাসানীদে" এবং "মাআযিম" ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু অবাক করা তথ্য হল, এই সনদগুলোর কোনোটিতেই ওয়াহাব ও কা'ব এর নাম কোথাও উল্লেখ নেই। আমি আমার গবেষণাটির সারাংশ দুই পৃষ্ঠায় সংকলন করে "আর রিসালাহ" ম্যাগাজিনে তখনি পাঠায়। আমি আশা করেছিলাম, তারা সেটা ইলমের খেদমত হিসেবে ছাপিয়ে দিবে। কিন্তু তারা সেটা ছাপায়নি।

এই দুইটি দৃষ্টান্ত হল এমন এক শতাধিক দৃষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আমাদেরকে এই বাস্তবতার স্পষ্ট বর্ণনা দেয় যে, ইসলামী শরীআহ এর দ্বিতীয় মূল মানদণ্ড হওয়ার কারণে হাদীসে নববী যতটুকু মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া আলেমগণের উপরে ওয়াজিব ছিল, ততটুকু তারা দেননি। যেটা ব্যতীত প্রথম মানদণ্ড সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন। এর ফলে তারা নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর হাদীসসমূহের ব্যাপারে মারাত্মক অজ্ঞতায় ফেঁসে গেছে। হাদীসগুলোকে সত্যায়ন থেকে দূরে সরে আসার এই বিষয়টি আগেই উদঘাটির হয়েছে। অথচ এগুলো নিশ্চিতরূপে নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – কর্তৃক আনীত দীনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

“আর রসূল তোমাদের নিকট যা এনেছেন, তা তোমরা আঁকড়ে ধরো” সূরা হাশর ৫৯:৭।

কিন্তু তারা কিছু বিষয় আঁকড়ে ধরল, আর কিছু বিষয় পরিত্যাগ করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا﴾

“তোমাদের মাঝে এমন কর্ম সাধনাকারীর পরিণতি একমাত্র দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা” সূরা আল বাকারা ২:৮৬।

মোটকথা হল: হাদিস শাস্ত্রবিদগণের নিকট আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সূত্রে সাব্যস্ত প্রত্যেক হাদীসের উপরে প্রত্যেক মুমিনকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। চাই তা আকীদা সংক্রান্ত হোক অথবা আহকাম সংক্রান্ত হোক। মুতাওয়াতির হোক অথবা আহাদ হোক। চাই আহাদ সংশ্লিষ্ট মুহাদ্দিসের নিকট অকাট্য ও ইয়াকীনকে সাব্যস্তকারী হোক অথবা অগ্রাধিকারযোগ্য তথ্যবিশিষ্ট হোক। এমন প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে ঈমান আনা ও সেটাকে মেনে নেয়া ওয়াজিব। এর দ্বারা প্রত্যেক মুমিন নিজের ব্যাপারে আহবানে সাড়া দেওয়ার এই আদিষ্ট বিষয়টিকে বাস্তবায়ন করতে পারবে। যা আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীতে বিদ্যমান:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে তিনি এমন বিষয়ের জন্য ডাকেন, যা তোমাদের জীবন সঞ্চার করে এবং জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মাঝে এবং তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। আর তাঁর নিকটেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে” (আল আনফাল ৮:২৪)।

এগুলো ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলোর আলোচনা এই প্রবন্ধের শুরুতে করা হয়েছে। আমি আল্লাহর নিকট আশা করি, তিনি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে (সকলকে) উপকৃত করবেন এবং এটাকে (ইবাদত হিসেবে) একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দিবেন, তাঁর কিতাবের জন্য সহযোগী, তাঁর নবীর সুন্নাতের সেবাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাসলীমা।

الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ তাকলীদকে মাযহাব ও দীন হিসেবে গ্রহণ করা

তাকলীদের বাস্তবতা ও তা থেকে সাবধানতা অবলম্বনঃ

তাকলীদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল এমন মালা, যার দ্বারা মানুষ অন্য কাউকে বেঁধে রাখে। এই অর্থেই تقليد الهدي — শব্দটি ব্যবহার হয়। যার অর্থ হলঃ হজ্জে ক্বুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুর শরীরে মালা পরিয়ে দেওয়া।

সুতরাং কেমন যেনো মুকাল্লিদ ব্যক্তি মুজতাহিদ ব্যক্তির বিধানকে মালা বানিয়ে তাকলীদকারীর গলায় ঝুলিয়ে দিলো।

পরিভাষায় তাকলীদ হলঃ কোনো দলীল ছাড়া অন্যের মতের উপরে আমল করা।

সুতরাং এর দ্বারা দলীল ছাড়া রসূল — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর কথার উপরে আমল করা ও ইজমা এর উপরে আমল করা, সাধারণ মানুষের মুফতীর নিকট স্মরণাপন্ন হওয়া এবং বিচারকের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের স্মরণাপন্ন হওয়ার বিষয়টি (তাকলীদ হিসাবে গণ্য হবে না) আলাদা হয়ে গেল। কারণ উক্ত বিষয়গুলোতে দলীল সাব্যস্ত হয়েছে[৩৭]।

উসূল শাস্ত্রের এই দলীলটি আমাদেরকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে অবহিত করেছেঃ

প্রথমটিঃ তাকলীদ কোনো উপকারী ইলম নয়।

শেষটিঃ এটা অজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাজ।

এই দুইটি বিষয়ের বাস্তবতা বর্ণনা করার জন্য উভয়টির ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ ধারণা থাকতে হবে। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে উভয়টির প্রতি

---

[৩৭] ইরশাদুল ফুহূল ২৩৪ নং পৃষ্ঠা। আমি বলবঃ এই বিষয়টি লক্ষ রাখা উচিত যে, তিনি "সাধারণ মানুষের মুফতীর নিকট স্মরণাপন্ন হওয়া" কে তাকলীদ থেকে পৃথক করেছেন এটা একমাত্র তার দেওয়া সংজ্ঞানুসারে সঠিক। অন্যথায় সাধারণ মানুষের মুফতীর স্মরণাপন্ন হওয়া এটা হুবহু আভিধানিক তাকলীদ। সুতরাং বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

দৃষ্টিপাত করতে হবে। উক্ত বিষয়ে ইমামগণের বক্তব্যসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করতে হবে। এরপরে আমরা দৃষ্টি রাখব তাদের অনুসারীদের – যারা তাদের অনুসারে তাদের (ইমামগণের) অনুসারী – অবস্থার প্রতি এবং তাদের মতামতের অনুসরণ করার সঠিকতা পর্যবেক্ষণ করব।

১ – তাকলীদ যে ইলম নয়, এর দলীল হল আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে একাধিক আয়াতে এর সমালোচনা করেছেন। এই জন্য এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞাসূচক বক্তব্য পূর্ববর্তী ইমামগণ থেকে একের পর এক বর্ণিত হয়েছে। আন্দালুসের ইমাম ইবনু আব্দিল বার – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – তার বিখ্যাত "জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাযলিহি" গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশ্লেষণে (২/১০৯-১১৪) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন। যার সারাংশ হল:

"তাকলীদ এর বিভ্রান্তি ও এর নিষেধাজ্ঞা এবং তাকলীদ ও প্রকৃত অনুকরণের মাঝে পার্থক্য":

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের একাধিক স্থানে তাকলীদের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾

"তারা (প্রকৃত রব) আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের যাজক ও সন্ন্যাসীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে" (আত তাওবাহ ৯:৩১)।

আর হুযায়ফা ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা বলেছেন:

"لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم" وقال عدي بن حاتم: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب فقال لي: "يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك" وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة "براءة" حتى أتى على هذه الآية: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} قال: قلت: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا قال "بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ " فقلت: بلى فقال: "تلك عبادتهم".

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করেনি, বরং তারা তাদের জন্য যেটাকে হালাল করেছে আর যেটাকে হারাম করেছে সেটাই তারা মেনে নিয়েছে"। আদী ইবনু হাতিম বলেছেন: "আমি আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর নিকট আসলাম, আমার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিল। তখন তিনি বললেন: হে আদী, তোমার গলা থেকে প্রতিমা নিদর্শন ফেলে দাও। আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে এই আয়াত পড়তে শুনলাম:

“তারা (প্রকৃত রব) আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে তাদের যাজক ও সন্ন্যাসীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে” (আত তাওবাহ ৯:৩১)।

তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল, আমরা তো তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেইনি। তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। তারা কি তোমাদের উপরে নিষিদ্ধকৃত বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করার পরে তোমরা সেটাকে হালাল হিসেবে মেনে নিতে না। আর আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এমন বিষয় তারা তোমাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করার পরে তোমরা সেটাকে হারাম মনে করতে না? তখন আমি বললাম: জ্বী, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: এটাই তাদের ইবাদত করা” ।

মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ٢٣ قَٰلَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾

“এমনিভাবে আমরা আপনার পূর্বে যেকোনো ভীতি প্রদর্শনকারীকে কোনো অঞ্চলে প্রেরণ করেছি, সেই অঞ্চলের বাসিন্দারা এই কথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভিন্ন একটি আদর্শে চলতে দেখেছি। আর আমরা তাদের আদর্শই অনুকরণ করব। তিনি বললেন: যদি আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের থেকে অধিক সুপথপূর্ণ আদর্শ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি, তথাপি তোমরা পূর্বের পথেই অবিচল থাকবে”? (আয যুখরুফ ৪৩:২৩, ২৪) ।

সুতরাং তাদের পিতৃপুরুষদের আদর্শের অনুকরণ তাদেরকে সুপথ প্রাপ্ত হওয়া থেকে বাঁধা দিয়েছে। তখন তারা বলল:

﴿إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾

“তোমাকে যেই (হেদায়েতপূর্ণ) আদর্শ দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, সেটাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম” (আয যুখরুফ ৪৩:২৪) ।

আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের ত্রুটি উল্লেখ করে তাদের সমালোচনা করে বলেছেন:

﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ ۝٥٢ قَالُواْ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ﴾

“এই প্রতিমাগুলো আসলে কী, যেগুলোর চারপাশে তোমরা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বসে থাক। তারা বলল: আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এগুলোর ইবাদত করতে দেখেছি” (আল আম্বীয়া ২১:৫২-৫৩)।

এমন দৃষ্টান্ত কুরআনে অনেক রয়েছে, যেখানে তিনি পিতৃপুরুষ ও নেতৃবর্গের তাকলীদের সমালোচনা করেছেন। আলেমগণ এই আয়াতসমূহের দ্বারা তাকলীদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তাদেরকে এই আয়তগুলো দ্বারা দলীল পেশ করার পথে তাদের কাফের হওয়ার বিষয়টি কোনো প্রকার বাঁধা সৃষ্টি করেনি। কারণ, এখানে সাদৃশ্যবিধান একজনের ঈমান ও অপরজনের কুফরের দিক থেকে করা হয়নি। বরং উভয়ের মাঝেই কোনো দলীল ছাড়া অন্ধ অনুসরণের দিক থেকে সাদৃশ্যবিধান করা হয়েছে। যেমন, কোনো ব্যক্তি অন্য আরেকজনের তাকলীদ করতে যেয়ে যদি কুফরী কাজ করে বসে, আর অপরজন কারোর তাকলীদ করতে যেয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়, আর আরেকজন কারোর তাকলীদ করতে যেয়ে কোনো ভুল করে বসে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই দলীল ছাড়া তাকলীদ করার কারণে সমালোচিত হবে। কারণ, এগুলোর প্রত্যেকটিই হল তাকলীদ, যা একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও এই ক্ষেত্রে গুনাহের পরিমাণ ভিন্নরকম হয়ে থাকে।

ইবনু মাসউদ রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলতেন:

اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك

“হয়ত আলেম হও, নয়ত ছাত্র হও। দুই পথের মাঝে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় দোদুল্যমান থেকো না” ।

তার থেকে অপর একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে:

كنا ندعوا الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال" يعني المقلد.

“আমরা জাহিলীয়াতের যুগে ইম্মাআহ ঐ ব্যক্তিকে বলতাম, যাকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলে নিজের সাথে আরেকজনকে নিয়ে আসত। আজকের দিনে তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি হল ঐ ব্যক্তি যে, নিজের অবহেলা করে দীনকে অন্য ব্যক্তিদের নিকট ফেলে রাখে”[৩৮]। তিনি এখানে মুকাল্লিদকে উদ্দেশ্য করেছেন।

ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع"

“ধ্বংস হোক ঐ সকল অনুসারীদের, যারা আলেমদের ভুল মতসমূহের অনুসরণ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল: সেটা কীভাবে হয়? তিনি বললেন: আলেম ব্যক্তি কখনো কোনো বিষয়ে নিজের বুদ্ধিনুসারে মত দেয়, এরপরে যখন সে আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর বক্তব্য সম্পর্কে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে পায়, তখন নিজের পূর্বের মতটি পরিহার করে। কিন্তু অনুসারীরা সেই মতের উপরেই অটল থাকে”। এরপরে ইবনু আব্দিল বার বলেন:

وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون"

নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: “এক সময় আলেমগণ হারিয়ে যাবেন। তখন মানুষ মুর্খ নেতৃবৃন্দকে আদর্শ বানাবে। তাদেরকে (দীন সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে। তখন তারা কোনো জ্ঞান

[৩৮] ইবনুল আছীর বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের দীনের দায়ভার যে কাউকে প্রদান করে এমন ব্যক্তির কথা তিনি বলেছেন। অর্থাৎ যে নিজের দীনকে অন্যের দীনের অনুগামী বানিয়ে রাখে কোনো দলীল, প্রমাণ ও বিবেচনা ছাড়াই। শব্দটি এসেছে أردف على الحقيبه শব্দটি থেকে। যার অর্থ হল: ব্যাগের মাঝে কোনো জিনিস রেখে সেটাকে পিঠেঝুলিয়ে দেওয়া থেকে।

ছাড়াই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে”[৩৯] ।

এগুলো সবই তাকলীদকে প্রত্যাখ্যান, তাকলীদের অসারতা সাব্যস্তকরণ এবং সঠিক পথের দিশা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এটা উপলব্ধি করতে পারে। সকল অঞ্চলের ইমামগণের মাঝে এই তাকলীদের অসারতার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং এটাই অধিক আলোচনার প্রয়োজনকে পূর্ণ করে।

হাদীসটি ইবনুল কাইয়্যিম আল ইলাম গ্রন্থে (২/২৯৪-২৯৮) বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম — রহিমাহুল্লাহু তা‘আলা — বলেছেন:

لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم.

“তাকলীদের মাধ্যমে ফতোয়া দেওয়া জায়েয নেই। যেহেতু এটা কোনো ইলম নয়। আর ইলম ছাড়া ফতোয়া দেওয়া হারাম। আর এই বিষয়ে কারোর দ্বিমত নেই যে, তাকলীদ ইলম নয়, আর মুক্বাল্লিদের উপরে আলেম শব্দের প্রয়োগ করা হয় না”। (আল ইলাম ১/৫১) ।

এমনিভাবে সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

إن المقلد لا يسمى عالما

মুকাল্লিদকে আলেম বলা যাবে না। যেভাবে আবূল হাসান সিন্ধী ইবনু মাজাহ এর প্রথম টীকায় বলেছেন।

ইরশাদুল ফুহূল গ্রন্থে (২৩৬) ইমাম শাওকানী অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেছেন:

"إن التقليد جهل وليس بعلم"

“নিশ্চয় তাকলীদ মুর্খতা। এটা ইলম নয়”।

[৩৯] ইমাম বুখারী ও মুসলিম এরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে। হাদীসটি আমার লিখিত আর রওযুন নাযীর কিতাবে (৫৪৯ নং) উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি উক্ত শব্দসহ অচিরেই উল্লেখ করা হবে।

আর এই বিষয়টি হানাফীদের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এই মাসআলাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: জাহেল ব্যক্তিকে বিচার কার্যের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া জায়েয নয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম "জাহেল" শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন মুকাল্লিদ দ্বারা।

نهي الأئمة عن التقليد

তাকলীদের ব্যাপারে ইমামগণের নিষেধাজ্ঞা:

এই বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো একের পর এক তাদের অথবা অন্যদের তাকলীদের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

১ – আবূ হানীফা – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – বলেছেন:

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".

"কারোর জন্য আমাদের মত গ্রহণ করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মতটি কোন দলীলের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছি সেটা সে না জানবে"।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে:

حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"

"আমার দলীল সম্পর্কে জানে না এমন ব্যক্তির জন্য আমার মত অনুসারে ফতোয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, আমরা মানুষ, আজকে এক কথা বলি, তো কালকে অন্য কথা বলি"।

২ – ইমাম মালিক – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – বলেছেন:

"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"

"আমি একজন মানুষ, যে ভুল ও সঠিক সকল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা আমার সিদ্ধান্তটি সঠিকরূপে বিচার করে দেখো। যা কিতাব ও

সুন্নাতের সাথে মিলে যায়, সেটাকে গ্রহণ করো। আর যা কিতাব ও সুন্নাতের সঙ্গে না মিলে, সেটা পরিত্যাগ করো" ।

৩ – ইমাম শাফেঈ – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – বলেছেন:

"أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد"

"মুসলিমগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যেই ব্যক্তির নিকট আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সুন্নাহ স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়, তার জন্য কোনো ব্যক্তির মতের কারণে উক্ত সুন্নাহ পরিত্যাগ করা বৈধ নয়"। তিনি আরো বলেছেন:

"كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي"

"কোনো মাসআলায় আমার মতের বিপক্ষে আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সূত্রে কোনো হাদীস যদি হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট সহীহ সাব্যস্ত হয়, তাহলে আমি আমার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে হলেও উক্ত মাসআলায় আমার পূর্বের মত প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘোষণা দিলাম"।

তিনি আরো বলেছেন:

"كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني"

"আমার বলা যেকোনো বক্তব্য, যদি তা নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সাব্যস্ত হওয়া হাদীসের বিপক্ষে যায়, তাহলে নবীর হাদীসই অধিক সঠিক। তখন তোমরা আমার তাকলীদ করো না" ।

৪ – ইমাম আহমাদ – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা বলেছেন:

"لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا "

“তোমরা আমার, তাকলীদ করো না। মালিক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরী কারোর তাকলীদ করো না। তারা যেই উৎস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকেই গ্রহণ করো”[৪০]।

তাদের থেকে থেকে এই বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ আছে যে, তারা বলেছেন:

"إذا صح الحديث فهو مذهبي"

“যখন হাদীস সহীহ হয়, তখন সেটাই আমার মাযহাব”।

এই জাতীয় আরো অনেক বক্তব্য তাদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমি তাদের বক্তব্যসমূহের একটি উৎকৃষ্ট অংশ আমার লিখিত গ্রন্থ[৪১] “সিফাতু সালাতিন নাবী” এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ে এখানে যতটুকু আলোচনা করলাম, তা যথেষ্ট।

[৪০] সিফাতু সালাতিন নাবী (২৩-৩৪ নং পৃষ্ঠা) ।

[৪১] প্রাগুক্ত।

العلم هو قول الله ورسوله

ইলম (দীনি জ্ঞান) হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাণী

যখন আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি তাকলীদের ব্যাপারে এমন, তখন তাদের বক্তব্যের মূল মর্মই হল, দলীল দ্বারা হক চিহ্নিত করতে পারেন এমন আলেমদের জন্য ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে কোনো কথা না বলা। কারণ, প্রকৃত ইলম একমাত্র এই দুইটি উৎসেই বিদ্যমান, ব্যক্তির রায়ের মধ্যে নেই।

এই জন্য ইমাম শাফেঈ আর রিসালাহ গ্রন্থে (৪১ নং পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং ১৩১-১৩২) বলেছেন:

فالواجبُ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساكُ أولى به أقرب من السلامة له إن شاء الله.

“সুতরাং আলেমদের জন্য ওয়াজিব হল, যেই উৎস থেকে তারা জ্ঞান অর্জন করেছেন, সেই উৎস অনুসারে কথা বলবেন। অথচ ইলমী বিষয়ে এমন ব্যক্তিও কথা বলেন, যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার কিছু বক্তব্যে মুখ বন্ধ রাখলে সেটা তার জন্য অধিক উত্তম ও অধিক নিরাপদ হতো। ইনশা আল্লাহ।

তিনি অপর স্থানে (পৃষ্ঠা ৩৯, ক্রমিক নং ১২০) বলেছেন:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شئ حلَّ ولا حرُم إلا من جهة العلم وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس

“কারোর জন্য কোনো হালাল হারাম সংক্রান্ত বিষয়ে ইলম এর সাহায্য ছাড়া অন্যকিছুর ভিত্তিতে কথা বলার অধিকার নেই। আর ইলম এর ভিত্তি হল, কিতাব অথবা সুন্নাহ অথবা ইজমা অথবা কিয়াস।

তিনি আরেকটি স্থানে বলেছেন: (পৃষ্ঠা ৫০৮/১৪৬৭-১৪৬৮):

"ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إلا من جهة علم

مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها "

“যদি কোনো ব্যক্তি আলেম না হওয়া সত্ত্বেও কোনো অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও কিয়াস ব্যতীত কোনো কথা বলে, তাহলে তার গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। আল্লাহ তা‘আলা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পরে কারোর জন্য পূর্ববর্তী ইলমের উৎস ব্যতীত কথা বলার অধিকার রাখেননি। আর তাঁর পরে ইলমের উৎস হল কিতাব ও সুন্নাহ, ইজমা ও আসার এবং এমন কিয়াস, যার স্পষ্ট বিবরণ কোনো উৎসের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে”।

সবচেয়ে বড় অন্যতম একটি মুসীবত, যা বিশেষ স্তরের মুসলিমদের মাঝে – সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা তো আরো মারাত্মক – আবির্ভূত হয়েছে, তা হল আজকের দিনে তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই – এবং আজকের পূর্বে কয়েক শতাব্দী যাবৎ - কিতাব ও সুন্নাহ এর দলীলসমূহ, সাহাবীগণের আসার ও ইমামগণের তাক্বলিদ সংক্রান্ত সমালোচনা এবং এটা ইলম নয় এই সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোর ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে।

ইলম হল একমাত্র তাই, যা আল্লাহ বলেছেন এবং আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন। আর এই জন্য তাদের কারোর মনে এই বিষয়টি উদয় হয় না যে, কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে প্রশংসিত ইলম হল, কিতাব ও সুন্নাহয় বর্ণিত আহকাম ও আক্বায়িদ সংক্রান্ত ইলম। আর যেই সকল আলেমগণকে কিতাব ও সুন্নাহয় প্রশংসা করা হয়েছে, তারা হলেন ঐ সকল আলেম, যারা উভয়টিতে বিদ্যমান ইলম অর্জন করেছেন। তারা ইমামগণের বক্তব্য ও তাদের ইজতিহাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নয়। এই জন্য তাদেরকে তুমি সেই বক্তব্যসমূহের মাঝে হয়রান অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা সেগুলোর মাঝে কিতাব ও সুন্নাহর বক্তব্যকে কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য থেকে পৃথক করতে পারে না। এমনিভাবে এই বিষয়টি তাদের কারোর অন্তরে কখনো উদয় হয় না, যখন সে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসগুলো অধ্যয়ন করে। যেমন:

يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ

“কিয়ামতের পূর্বে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। আর অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে”।[৪২]

বিষয়টি হল, উক্ত দলীলে ইলমের মর্মের মাঝে মুকাল্লিদদের ইলমও শামিল হবে, যা অজ্ঞতা। কারণ, পূর্বে বর্ণিত ইমামগণের বক্তব্য অনুসারে তার নিকট কোনো ইলম নেই। এমনিভাবে সে কখনোই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী শুনে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট থেকে সরাসরি ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। কিন্তু তিনি ইলমকে উঠিয়ে নিবেন আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে”।[৪৩]

এই কথা ভাবে না যে, এখানে আলেমগণ বলতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ এর আলেমদের কথা বুঝানো হয়েছে। বরং তারা কোনো একজন তাকলীদপন্থি শায়েখের মৃত্যুতে এই হাদীস উল্লেখ করে। এমনিভাবে অন্যান্য হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বুঝতেও তারা ভুল করে:

«حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»

“এমনকি যখন তিনি আর কোনো আলেম দুনিয়ায় রাখবেন না, তখন মানুষ মুর্খ নেতৃবর্গকে আলেম মনে করবে। আর তাকে দীন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। তখন তারা জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দিবে (বুখারীর শব্দটি হল: তারা তাদের রায় অনুসারে ফতোয়া দিবে)। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে”।[৪৪]

তারা মনে করে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ সকল সাধারণ মানুষ, যাদের নিকট তাকলীদ সম্বলিত ফিকহের কোনো জ্ঞান নেই। যাদের নিকট মাযহাব সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই। অথচ প্রকৃত সত্য হল, এই বৈশিষ্টের মাঝে ঐ সকল মুকাল্লিদ অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা ইমামগণের ইজতিহাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সেই ইজতিহাদসমূহে কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত তাদের তাকলীদ করে পরিতৃপ্তি অর্জন করেছে। এই মর্মের দিকে ইতোপূর্বেই ইবনু

---

[৪২] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, সহীহ বুখারী হা/৭০৬৪, সহীহ মুসলিম হা/২৬৭২।

[৪৩] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, সহীহ বুখারী হা/১০০, সহীহ মুসলিম হা/২৬৭৩।

[৪৪] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, সহীহ বুখারী হা/১০০, সহীহ মুসলিম হা/২৬৭৩।

আব্দিল বার এর বক্তব্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের আলোচিত দাবিটি আরো শক্তিশালী সাব্যস্ত হয় এই হাদীসের দ্বারা বিস্তারিতভাবে মুজতাহিদ মুক্ত যুগের ব্যাপারে আলেমগণের দলীল পেশ করার দ্বারা। যা ফাতহুল বারীতে (১৩/২৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে। তারা এর দ্বারা এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, উক্ত হাদীসে আলেমগণ দ্বারা উদ্দেশ্য হল: মুজতাহিদ্গণ। আর নেতৃবর্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হল: জাহেল মুকাল্লিদগণ।

আর এই বিস্তীর্ণ মুর্খতার মূল রহস্য হল, প্রকৃত ইলম সম্পর্কে তাদের মুর্খতা। ঐ আলেম কে, যার দিকে এই আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ সঠিকভাবে প্রত্যাবর্তনযোগ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ﴾

"যার জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনো সমান হতে পারে" (আয যুমার ৩৯:৯)। তিনি আরো বলেছেন:

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ﴾

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা কয়েকগুণ উন্নীত করে দিবেন" (আল মুযাদালাহ ৫৮:১১)।

নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন:

«فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»

"একজন আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা ঠিক তেমন, যেমন তোমাদের মাঝে সর্বনিম্নস্তরের ব্যক্তির উপরে আমার মর্যাদা"। তিরমিযী[৪৫]

এবং তিনি আরো বলেছেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

[৪৫] হাদীসটির সনদ সহীহ। তিরমিযী হা/২৬৮৫, যেমনটি আমরা মিশকাতের তাখরীজে (২১৩) বর্ণনা করেছি।

“যখন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়: সাদাকা জারীয়া, অথবা কল্যাণকর ইলম, অথবা এমন নেককার সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে”।[৪৬] এবং তিনি আরো বলেছেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

“যে ব্যক্তি আমাদের বয়স্ক ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে না, আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমের প্রকৃত মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়”। আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম।[৪৭]

আলেমগণ ও ইলমের ফযীলত সম্পর্কে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আছে। হাফেয ইবনু আব্দিল বার (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি) গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। সেখানে (২/২৩) তিনি বলেছেন:

“পরিচ্ছেদ: “ইলমের উসূল ও এর হাকীকত এবং যেই শাস্ত্রের উপরে ফিকহ ও ইলম উভয়টির প্রয়োগ করা যায়”। জনৈক আল্লামা তার গ্রন্থ “ঈকাযু হিমামি উলীল আবসার” এ (২৩-২৬ নং পৃষ্ঠা) তার অনুকরণে একই শিরোনাম রচনা করেছেন। এরপরে তারা উভয়েই উক্ত শিরোনামের অধীনে এমন কিছু হাদীস ও আসার উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তাদের শিরোনামের দাবির পক্ষে। আর জনৈক আলেম এই বক্তব্য দ্বারা তার আলোচনাটি শেষ করেছেন:

“আমি বলব: এই হাদীস ও আসারসমূহ এই বিষয়ে পূর্ণ স্পষ্ট যে, ইলম শব্দটির প্রকৃত প্রয়োগ একমাত্র আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সুন্নাহ ও ইজমা এর মাঝে বিদ্যমান বিষয়ের উপরে। অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো দলীল না থাকলে উক্ত মৌলিক উৎসগুলোর উপরে যেই কিয়াস করা হয়, সেই কিয়াসের উপরে তাদের মতানুসারে যারা কিয়াসকে মূল ভিত্তি মনে করেন।

তাকলীদ ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ধারক বাহকদের অনুসৃত সীমাবদ্ধ ইলমের উপরে এর প্রয়োগ হতে পারে না, যা ব্যক্তি রায়ের আলোকে সংকলিত

[৪৬] সহীহ মুসলিম হা/১৬৩১।

[৪৭] হাদীসটির সনদ হাসান। যেমনটি আত তারগীব গ্রন্থের (১/৪৬) তাখরীজে বর্ণনা করেছি।

মাযহাবের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। অথচ তাদের কিছু মত হাদীসে নববীর সাথে সাংঘর্ষিক”।

মোটকথা: **তাকলীদ নিন্দিত। কারণ, এটা অজ্ঞতা। এটা কোনো ইলম নয়। প্রকৃত ইলম হল কিতাব ও সুন্নাহর ইলম এবং উভয়টির ব্যাপারে গভীর পারদর্শিতা অর্জন করা।**

جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل

দলীল বুঝতে অপারগ ব্যক্তির জন্য তাকলীদ করার বৈধতা:

কোনো প্রশ্নকারী যদি বলে: এই অর্থে যে কেউ আলেম হতে পারবে না। তাহলে আমরা বলব: হ্যাঁ। বিষয়টা সঠিক। তবে এই বিষয়ে কে দ্বিমত করছে? এই বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾

“যদি তোমরা না জান, তাহলে জ্ঞানী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করো” (সূরা আল আম্বীয়া ২১: ৭)। তিনি আরো বলেছেন:

﴿فَسۡـَٔلۡ بِهِۦ خَبِيرٗا﴾

“তাঁর ব্যাপারে তুমি তাঁর সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করো” (সূরা আল ফুরকান ২৫:৫৯)।

নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – না জেনে ফতোয়া প্রদানকারীদের ব্যাপারে বলেছেন:

"ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال

“যদি তারা না জেনে থাকে, তাহলে কেনো জিজ্ঞাসা করল না? অজ্ঞতার একমাত্র চিকিৎসা হল জিজ্ঞাসা”।[৪৮]

অথচ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কে সেটা পারবে আর কে পারবে না তা ছিল না। বরং আমাদের আলোচনার মূল প্রবাহ ছিল ঐ সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে, যাদেরকে আহলুল ইলম মনে করা হয়। যাদের জন্য যাবতীয় মাসআলা অথবা কমপক্ষে আংশিক কিছু মাসআলা দলীল সহ শনাক্তকরণ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তারা মাযহাবের যাবতীয় মতামতের আলেম। কিতাব ও সুন্নাহর ব্যাপারে জাহেল। সুতরাং এখানে কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। বিশেষভাবে যেহেতু আমি এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, বর্ণিত মৌলিক দলীলটি আমাদের সামনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাব্যস্ত করেছে:

প্রথমটি: তাকলীদ কোনো উপকারী ইলম নয়। উক্ত বিষয়ে আমি সন্তোষজনক আলোচনা করব। ইনশা আল্লাহ।

সর্বশেষটি: এটা জাহেল বা সাধারণ মানুষের কাজ। সুতরাং এর দ্বারা দলীলসমূহ শনাক্ত করতে সক্ষম আলেম তাকলীদের গণ্ডী থেকে বের হয়ে গেল। আর তার কর্তব্য তাকলীদ করা নয়। বরং ইজতিহাদ করা। আর এই বিষয়টিকে আরো স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করার জন্য সর্বশেষ বিষয়টির ব্যাখ্যা করা দরকার। তাই আমি বলব: সংক্ষিপ্তরূপে পূর্বে বর্ণিত আলোচনার পরে ইবনু আব্দিল বার বলেছেন:

“এই সবই হল সাধারণ মানুষ ব্যতীত অন্যদের জন্য। কারণ, সাধারণ মানুষদেরকে তাদের জীবনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাদের আলেমগণের তাকলীদ করতে হবে। কারণ, তারা দলীলের প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে জানে না। তারা না বুঝার কারণে সেটা জানার সামর্থও রাখে না। কারণ, ইলম হল অনেকগুলো স্তরের নাম। যার সর্বনিম্ন স্তরে আরোহণ করা ব্যতীত সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর এটাই হল সাধারণ মানুষ আর তাদের দলীল অনুসন্ধানের মাঝে ব্যবধান। আল্লাহই ভালো জানেন। আর সাধারণ মানুষদের জন্য তাদের আলেমগণের তাকলীদ করা জরূরী এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। আর তারাই হলেন মহান আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ:

---

[৪৮] হাসান: আবূ দাউদ হা/৩৩৬

“যদি তোমরা না জান, তাহলে আলেমগণকে জিজ্ঞেস করো” ।

তারা এই বিষয়ে ইজমা করেছেন যে, অন্ধ ব্যক্তিকে অবশ্যই এমন ব্যক্তির তাকলীদ করতে হবে, যার প্রতি সে ক্বিবলা শনাক্তকরণের ব্যাপারে ভরসা করতে পারে। যখন তার জন্য ক্বিবলা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়। এমনিভাবে ঐ ব্যক্তির বিধানও একই, দীনের রীতি-নীতি সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি নেই। তার জন্য আবশ্যক হল তার আলেমের তাকলীদ করা। এমনিভাবে এই বিষয়েও কোনো আলেম মতানৈক্য করেনি যে, সাধারণ মানুষের জন্য ফতোয়া জায়েয নেই। এটা এই জন্য — আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন — যে, হালাল-হারাম ও ইলম সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলা বৈধ হওয়ার জন্য যেসকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলোতে তাদের অজ্ঞতা” ।

তা ছাড়া আমি মনে করি, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে সরাসরি এই বক্তব্য দেওয়া এবং তার জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক এই বিষয়টিতে কিছু ত্রুটি আছে। কারণ, যখনি তুমি বলবে যে, তাকলীদ হল দলীল ছাড়া অন্যের মতের উপরে আমল করা। তখন অনেক ক্ষেত্রে কিছু মেধাবী সাধারণ ব্যক্তির জন্য দলীল নির্ণয় করা সহজ হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট দলীলে বিদ্যমান দলীলটি অধিক স্পষ্ট হওয়ার কারণে, যা তার নিকট পৌঁছেছে। সুতরাং এই ধারণা কে করতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জাতীয় বাণীতে বিদ্যমান দলীল তাদের নিকট স্পষ্ট নয়:

“তায়াম্মুম হল গোটা মুখ ও দুই হাতের কবজির জন্য (মাটিতে) একবার হাত মারা” । বরং তাদের চেয়ে তুলনামূলক কম মেধাবীদের পক্ষেও এমন দলীল বুঝা সম্ভব। এই জন্য এটা বলাই সর্বাধিক বাস্তবসম্মত: যে ব্যক্তি দলীল বুঝতে অপারগ, তার উপরে তাকলীদ করা ওয়াজিব। আর আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কর্তব্য চাপিয়ে দেন না।

এই আলোচনার শেষে এই বিষয়টির সমর্থনে ইবনুল কাইয়্যিম — রহিমাহুল্লাহু তা'আলা — এর বক্তব্য উল্লেখ করা হবে। যেভাবে একজন আলেমও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক মাসআলায় তাকলীদ করতে বাধ্য হয়। যখন সে উক্ত মাসআলাগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর থেকে কোনো দলীল অনুসন্ধান করে পায় না। তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তির মত ব্যতীত অন্য কোনো মত সে পায় না, তখন সেও তার তাকলীদ করে বাধ্য হয়। যেমনটি ইমাম শাফেঈ — রহিমাহুল্লাহু তা'আলা — কোনো

কোনো মাসআলায় করেছেন। এই জন্য ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – (২/৩৪৪) বলেছেন:

"وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب فإن التقليد إنما يباح للمضطر وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع مقدرته على المذكى فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم"

"এটা আলেমের কাজ। আর এটা তার জন্য ওয়াজিব। কারণ, তাকলীদ একমাত্র নিরুপায় ব্যক্তির জন্য বৈধ। আর যে ব্যক্তি কিতাব, সুন্নাহ, সাহাবীগণের বক্তব্য ও দলীল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তাকলীদের দিকে ফিরে গেল, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে জবেহকৃত (হালাল) পশু পরিত্যাগ করে মৃত পশু (হারাম) গ্রহণ করল। কারণ, মূলনীতি হল, দলীল ব্যতীত অন্যের মত গ্রহণ না করা। সুতরাং নিরুপায় পরিস্থিতিকে মুকাল্লিদগণ তাদের দলীলের ভিত্তি বানিয়েছেন"। ইলামুল মুয়াক্কিঈন।

محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد

ইজতিহাদের সাথে মাযহাবপন্থিদের সংঘর্ষ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাকলীদকে করতে বাধ্য করা:

যখন এটা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল, তখন আমাদের সামনে পূর্বে অঙ্গীকারকৃত বিষয়বস্তু অর্থাৎ ইমামগণের অনুসরণের দাবিদারদের সার্বিক অবস্থা ও তাদের মতামতের অনুসরণের সঠিকতার বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনার কাজটি অবশিষ্ট থাকল। উক্ত বিষয়ে আমি বলব:

"দীর্ঘদিন যাবৎ তাকলীদকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ শায়েখদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত অদ্ভুত। কারণ, তারা যেই মুহূর্তে এই দাবি করে যে, তারা আহকাম বুঝার ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহর স্মরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না এবং তাদের

জন্য তাদের ইমামগণের তাকলীদ করা বাধ্যতামূলক। ঠিক একই মুহূর্তে তুমি দেখবে, তারা নিজেদেরকে মুর্খতার দিকে সম্বন্ধ করতে ইচ্ছুক নন। অথচ এটাই তাদের আলেমগণের বক্তব্যের মূল দাবি। বরং আমরা তাদেরকে দেখেছি, তারা তাকলীদের ক্ষেত্রে তাদের ইমামগণের অনেকগুলো উসূল ভঙ্গ করেছে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক কায়দা প্রণয়ন করেছে। অথচ তাকলীদের দাবিদার হিসেবে তাদের জন্য এটা করার কোনো অধিকার নেই।

বিশেষত, যখন সেটা কিতাব ও সুন্নাহর দলীলসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তারা কায়দাগুলো প্রণয়ন করেছে তাদের পূর্ববর্তী আদেশসমূহ অমান্য করে শুধু শাখাগত মাসআলাসমূহে নিজেদের উপরে তাদের ইমামগণের তাকলীদ বাধ্যতামূলক করার জন্য। তারা দাবি করেছে "মুতলাক মুজতাহিদ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে"[৪৯]। আর তাদের নিকট এই মতটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, চতুর্থ হিজরী শতকের পরে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কথা ইবনু আবিদীন তার টিকায় (১/৫৫১) উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের জন্য কিতাব ও সুন্নাতের ফিকহ অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে। আর তাদের উপরে চার মাযহাবের যেকোনো একজন ইমামের তাকলীদ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। যেমনটি সে আল জাওহারাহ গ্রন্থে বলেছে:

"তাদের মধ্যে অভিজ্ঞ শাস্ত্রবিদের তাকলীদ করা ওয়াজিব এমনটিই ফকীহ সম্প্রদায় বোধগম্য শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন"।

তারা আরো দাবি করেছে যে, 'ইলমুল হাদীস ও 'ইলমুল ফিকহ পূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছে এবং দগ্ধ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছে[৫০]। তারা বিষয়টিকে আরো শক্তিশালী করেছে এবং অনিবার্য করেছে আবূল হাসান কারখীর এই বক্তব্য দ্বারা: প্রত্যেক এমন আয়াত, যা আমাদের মাযহাবের ফকীহগণের মতের বিরোধী, তা হয়ত তাবীলযোগ্য অথবা রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনিভাবে এমন যেকোনো হাদীসও হয়ত তাবীলযোগ্য অথবা রহিত[৫১]। এই জন্য যখনি তুমি কোনো আয়াত বা হাদীস তাদের নিকট নিয়ে যাবে, তারা নিজেদের জন্য তাৎক্ষণিক সেটার মর্মকে খণ্ডন করা নিজেরদের জন্য বৈধ মনে করে। উভয়টির মর্মে আর উভয়টি আসলেই কি মাযহাবের মত বিরোধী কি না সেই বিষয়ে

[৪৯] আদ্দুররুল মুখতার (১/৪৫ টীকা)।

[৫০] আদ্দুররুল মুখতার (১/৪৫ টীকা)।

[৫১] প্রাগুক্ত।

কোনো প্রকার চিন্তা-ফিকির না করেই তারা এটা করে। তারা তোমাকে তাদের এই কথার দ্বারা উত্তর দিবে: তুমি বেশি জান নাকি মাযহাব বেশি জানে?!

مخالفة المذهبيين لأئمتهم في التعصب لهم وفرض تقليدهم

মাযহাবপন্থিদের নিজ নিজ ইমামের পক্ষপাতিত্ব ও তাদের তাকলীদকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে তাদের ইমামগণের আদর্শের অবাধ্য হওয়া:

তারা তাদের ইমামগণের ওসীয়তের বিপরীতে এই জাতীয় নব্য নীতিমালা প্রণয়নের দ্বারা নিজেদের অন্তরে এবং ইলম অন্বেষী ছাত্রদের অন্তরেও তাকলীদকে স্থাপন করে দিয়েছে।

তারা এর দ্বারা কিতাব ও সুন্নাহর ফিকহ অর্জনের পথে তাদেরকে বাধা দিয়েছে। আর তাদের পরিভাষায় ফিকহ শুধুমাত্র তাদের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান তাদের আলেমগণের বক্তব্য অনুধাবন আর বিশ্লেষণের নাম। এই সবকিছুর পরেও তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বরং তারা সকলকে মাযহাবের পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করেছে। যেমন, এই বিষয়ে তাদের অনেকের বক্তব্য এমন: "যখন আমাদেরকে আমাদের মাযহাব এবং আমাদের বিপক্ষের মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে? আমরা অবশ্যই উত্তরে বলব: আমাদের মাযহাব সঠিক, তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর আমাদের বিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আর যখন আমাদেরকে আমাদের এবং আমাদের প্রতিপক্ষের আকীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, তখন আমরা অবশ্যই উত্তরে বলব: আমরা যেই আকীদার উপরে আছি, সেটাই একমাত্র হক। আর আমাদের প্রতিপক্ষ যেই মতের উপরে আছে, তা বাতিল"[৫২]। তথাপি এই মতসমূহ, যেগুলো আমরা উল্লেখ করিনি, তাদের অনুসৃত ইমামগণের মধ্যে কেউ এমন কথা বলেনি। বরং তারা তো এই জাতীয়

---

[৫২] আল্লামা আল খিদ্বরী রচিত "তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী" (৩৩২ নং পৃষ্ঠা)।

বুলি আওড়ানোর থেকে অনেক উর্ধ্বে। তারা অধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক ভয়কারী। সুতরাং এই কথাগুলো দুইটি কারণে স্পষ্ট বাতিল:

এক: এগুলো কিতাব ও সুন্নাহর এমন অনেক দলীলসমূহের বিপরীত, যেগুলো মানুষকে একমাত্র ইলম বিহীন কথা না বলার আদেশ দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ﴾

"আপনি জানেন না এমন বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না"। বনী ইসরাঈল ১৭:৩৬

আর তুমি এটাও ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছ যে, একমাত্র প্রকৃত ইলম হল, যা কুরআন ও সুন্নাহয় বিদ্যমান। তাহলে তাদের বিবৃত এই জাতীয় মন্তব্যের নির্দেশনা কিতাব ও সুন্নাহয় কোথায় আছে?

দুই: তারা তাকলীদের দাবি করে। আর মুক্বাল্লিদের জন্য তার ইমামের বক্তব্য শক্তিশালী দলীল। যেমনটি তাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে এমন মন্তব্য তাদের ইমামের বক্তব্যে অনুপস্থিত কেনো? ইমামগণ এমন কথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث

মুকাল্লিদগণের মাঝে মতানৈক্যের আধিক্যতা এবং আহলুল হাদীসদের মাঝে এর স্বল্পতা:

যে এই বিষয়টি জানে, সে ভালো করেই জানে যে, মুকাল্লিদদের বিভক্ত উপদলসমূহের এই দীর্ঘ শতক যাবৎ কলংকজনক বিভক্তির উপরে টিকে থাকার কারণ কী। এমনকি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ ভিন্নপন্থি মাযহাবের ইমামের পেছনে সালাত বাতিল হওয়া অথবা মাকরূহ হওয়ার ফতোয়াও দিয়েছে। বরং তাদের অনেকে হানাফী পুরুষকে শাফেঈ মাযহাবের নারীর সঙ্গে বিবাহ করতে পর্যন্ত বাঁধা দিয়েছে। আবার অন্যজন এটাকে (অর্থাৎ

হানাফী পুরুষের শাফেঈ নারীকে বিবাহ করা) জায়েয বলেছে, কিন্তু বিপরীত অবস্থাকে (অর্থাৎ শাফেঈ পুরুষের হানাফী নারীকে বিবাহ করা) অবৈধ বলেছে। এই মতের কারণ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি শাফেঈদেরকে আহলুল কিতাবের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। যেনো আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেননি:

﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যাদের নিকট স্পষ্ট দলীলসমূহ আসার পরে তারা বিভক্ত ও মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ছে" (আলে ইমরান ৩:১০৫)। তিনি আরো বলেছেন:

﴿فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

অতঃপর লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের এ বিষয় তথা দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।(আল মুমিনূন ২৩:৫৩)।

ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – (১/৩১৪) বলেছেন:

"যুবুর শব্দের অর্থ হল অনেকগুলো কিতাব। অর্থাৎ প্রত্যেক বিভক্ত দলই অসংখ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছে এবং সেগুলোকে আঁকড়ে ধরেছে। মানুষদেরকে তারা সেই দিকে আহবান করছে। অন্যান্যদের গ্রন্থগুলোকে তারা পরিত্যাগ করেছে। বাস্তবতা হুবহু এমনি"।

আমি বলব: "সম্ভবত এগুলো ঐ গ্রন্থসমূহই হবে, যেগুলোর প্রতি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস – রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা – ইঙ্গিত করেছেন। যা আমর বিন ক্বায়েস আস সাকূনী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي الْوَفْدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَأَنْ يُخْزَنَ الْفِعْلُ وَالْعَمَلُ وَيَظْهَرَ الْقَوْلُ، وَأَنْ يُقْرَأَ بِالْمُثَنَّاةِ فِي الْقَوْمِ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُغَيِّرُهَا أَوْ يُنْكِرُهَا» فَقِيلَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ: «مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

একদা আমি একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমার পিতার সাথে মুআবীয়ার নিকট গেলাম। সেখানে একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করতে শুনলাম:

“কিয়ামতের অন্যতম ‘আলামত হল, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের মর্যাদা উন্নীত করা হবে। আর মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সম্মান হ্রাস করা হবে। কর্ম ও শ্রম সংগ্রহ করে রাখা হবে। মনগড়া মতবাদ প্রাধান্য বিস্তার করবে। মুসান্না (ইহূদী আলেমদের রচিত বানোয়াট গ্রন্থসমূহ) লোক সম্মুখে বেশি বেশি পাঠ করা হবে। কিন্তু এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না, যে সেই গ্রন্থগুলোর বিরোধিতা করবে অথবা খণ্ডন করবে”।

তখন তাকে প্রশ্ন করা হল: “মুসান্না কী? তিনি বললেন: আল্লাহ তা‘আলার আসমানী গ্রন্থ বাদ দিয়ে যেই গ্রন্থগুলো মানুষ মনগড়া মতবাদের আলোকে রচনা করেছে”[৫৩]।

সম্ভবত এই কারণেই ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ – কিতাব ও সুন্নাহর অনুকরণের প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়ার কারণে – শাখাগত মাসআলার বিশ্লেষণ ও রায় সম্বলিত গ্রন্থসমূহ রচনা করা অপছন্দ করতেন। মানুষ সেগুলোকে কিতাব ও সুন্নাহর উপরে প্রাধান্য দিয়ে দিবে এই ভয়। যেমনটি মুকাল্লিদগণ সম্পূর্ণরূপে করেছেন। কারণ, তারা মতানৈক্যের সময় তাদের মাযহাবকে কিতাব ও সুন্নাহর উপরে প্রাধান্য দেন এবং এটাকেই উভয়টির মানদণ্ড নির্ধারণ করে। যেমনটি ইতোপূর্বে কারখী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অথচ ওয়াজিব হল কিতাব ও সুন্নাহর অনুকরণ করা। যেমনটি কিতাব ও হাদীসের পূর্ববর্তী দলীলসমূহের সিদ্ধান্ত। যেমনটি তাদের ইমামগণের বক্তব্য তাদের উপরে আবশ্যক করে। তাদের জন্য ওয়াজিব হল, অন্যান্য মাযহাবের কিতাব ও সুন্নাহ সম্বলিত মতসমূহ নিজেদের মাযহাবের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া। কিন্তু আফসোসের বিষয়, তারা একে অপরের সাথে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। এই জন্য ইবনুল কাইয়্যিম (২/৩৩৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী উল্লেখ করে বলেছেন:

وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

[৫৩] হাদীসটি হাকেম উল্লেখ করেছেন (৪/৫৫৪-৫৫৫)। এবং তিনি বলেছেন: সহীহ ইসনাদ। আর যাহাবী তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। হাদীসটি যদিও মওকূফ, তথাপি এটার স্তর মারফূ এর সমমানের। কারণ এটা গায়েবী সংবাদগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রায় দ্বারা বলা যায় না। বিশেষত যেহেতু হাদীসটি হাকেমের সনদে অনেক রাবী মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে সহীহও বলেছেন।

"তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে বেঁচে থাকবে, অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের উপরে আবশ্যক হল আমার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা"।[৫৪]

"এটা মূলত মতানৈক্যকারীদের সমালোচনা। তাদের পথে চলতে সতর্কীকরণ। আর মতানৈক্য ও বেশি হওয়া এবং এতো মারাত্মক হওয়ার একমাত্র কারণ হল, তাকলীদ ও মুকাল্লিদগণ। যারা দীনকে শতধা বিভক্ত করেছে এবং দীন পালনকারীদের মাঝে অসংখ্যা দল সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক দল তার নেতার পক্ষে কথা বলে। তার দিকে আহবান করে। তার আদর্শের বিরোধিতাকারীর সমালোচনা করে ও তাদের মতের উপরে আমল করাকে বৈধ মনে করে না। মনে হয় যেনো তারা একটি ভিন্ন জাতি, যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদের মত খণ্ডনের জন্য কঠোর অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম করে।

তারা এভাবে কথা বলে: "তাদের কিতাব" ও "আমাদের কিতাব"। "তাদের ইমাম" ও "আমাদের ইমাম"। "তাদের মাযহাব" ও "আমাদের মাযহাব"। অথচ নবী এক। কুরআন এক। রব একজন। সুতরাং সকলের জন্যই ওয়াজিব হল, তারা সকলেই "তাদের মাঝে সাধারণ (ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়) ও সমানভাবে মান্য বিষয়" এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর একমাত্র আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করবে। তাঁর দলীলসমূহের পাশে অন্য কারোর মতকে দলীলের ন্যায় সমমানের মর্যাদা দিবে না। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে একে অপরকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি এই বিষয়ে তারা একমত হতে পারে এবং তারা প্রত্যেকেই যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে আহবানকারীর নিকট নিজেদেরকে সমর্পিত করতে পারে এবং সকলেই নিজেদের যাবতীয় বিষয়াদির সমাধানের ক্ষেত্রে সুন্নাহ ও সাহাবীগণের আসারসমূহের দ্বারস্থ হতে পারে, তাহলে মতানৈক্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। যদিও তা চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হয়। এই জন্য তুমি দেখবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীসের মাঝে মতানৈক্য সবচেয়ে কম। ভূপৃষ্ঠের উপরে তাদের চেয়ে অধিক সহমতপূর্ণ ও স্বল্প মতানৈক্যপূর্ণ দল আর একটি নেই। যেহেতু তারা এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। আর যখনি হাদীস থেকে দূরত্ব বাড়বে, তখনি নিজেদের মাঝে তাদের মতানৈক্য গভীর ও শক্ত হবে। কারণ, যে হককে প্রত্যাখ্যান করে, হকের প্রকৃত অবস্থা তার নিকট জটিল হয়ে যায় এবং (বাতিলের সাথে) মিশে

[৫৪] হাসান সহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৬০৭, তিরমিযী হা/২৬৭৬, ইবনে মাজাহ হা/৪৩

যায়। ফলে সঠিক পথ তার নিকটে সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে সে বুঝতে পারে না কোন পথে যাবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِىٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾

"বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে যখন তাদের নিকট তা এসেছে। ফলে তারা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে" (ক্বফ ৫০:৫)।

তিনি আরো (২/৩৪৭) বলেছেন:

"আমরা এটা দাবি করি না যে, আল্লাহ তা'আলা দীনের ছোট-বড় সকল মাসআলায় তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে সত্যকে দলীল দ্বারা অবগত হওয়া ফরয করেছেন। আমরা শুধুমাত্র তাই প্রত্যাখ্যান করছি, যা সাহাবীগণ ও তাবেঈন প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর শ্রেষ্ঠযুগগুলো অতিবাহিত হওয়ার পরে চতুর্থ শতাব্দীতে ইসলামে যে নব্য পন্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবান মুবারকে সমালোচিত হয়েছে।

অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে অনুকরণীয় মনে করে। তার সকল ফতোয়া শরীআত প্রণেতার আইনের সমমানের মনে করা। বরং সেগুলোকে তাঁর আইনের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া। আর তার মতকে আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর পরবর্তী তাঁর উম্মতের সকল আলেমগণের মতের উপরে প্রাধান্য দেওয়া, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের মতসমূহ থেকে বের হয়ে শুধুমাত্র তার ইমামের তাকলীদ করা এবং এর সাথে এই বিশ্বাস সংযুক্ত করে দেওয়া যে, তার ইমাম একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো কথা বলেন না। কিন্তু এগুলো সবই আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর জবান মুবারকে সমালোচিত হয়েছে। অথচ এই বিশ্বাস এমন বিষয়ের সাক্ষ্যযুক্ত, যেই বিষয়ে সাক্ষী সঠিকভাবে কিছু জানে না। যা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে না জেনে বলার নামান্তর। এতে রয়েছে তার (মুকাল্লিদ) প্রতিপক্ষ সম্পর্কে "সে কিতাব ও সুন্নাহর ব্যাপারে ভুল করেছে" মর্মে সংবাদ রয়েছে। অথচ সে (প্রতিপক্ষ) তার চেয়েও বড় আলেম। আবার সে বলে: আমার ইমাম সঠিক। অথবা এভাবেও বলে: উভয়েই কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক বলেছেন। অথচ উভয়ের মতেই রয়েছে পারস্পরিক সংঘর্ষ। ফলে সে কিতাব ও সুন্নাহর দলীলসমূহকে পরস্পর সাংঘর্ষিক ও মতবিরোধপূর্ণ বলে আখ্যা দিল। যেনো

আল্লাহ ও তাঁর রসূল একই সময়ে বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত দেন। অথচ তার দীন হল ব্যক্তি রায় নির্ভর। মূল বিষয়বস্তুতে তার নিজস্ব কোনো নির্দিষ্ট মত নেই। সুতরাং তাকে হয়ত এই পথেই চলতে হবে অথবা তার ইমামের বিরোধিতাকারীর ভুল চিহ্নিত করতে হবে। এই দুইটি বিষয়ের মাঝে তাকে যেকোনো একটি বিষয়কে অবশ্যই বেছে নিতে হবে। আর এটা তার উপরে তাকলীদের বরকতের ফলেই ঘটেছে।

যখন এই বিষয়টি বুঝা গেল, তখন আমরা বলব: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপরে তাদের সাধ্যানুযায়ী তাঁর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বনকে ওয়াজিব করেছেন। আর তাকওয়ার মূল উৎস হল তাকওয়ার মাধ্যম বা হাতিয়ার চেনা। এরপরে সেই অনুযায়ী আমল করা। সুতরাং প্রত্যেক বান্দার উপরেই ওয়াজিব হল, তাকওয়ার মাধ্যম চেনার ক্ষেত্রে সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মান্য করা। এরপরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের লাগাম আঁকড়ে ধরতে হবে ঐ বিষয়ে, যা তার নিকট অস্পষ্ট। আর তখন ঐ বিষয়ে সে হবে রসূল ব্যতীত তার সমমানের অন্যান্য ব্যক্তিদের আদর্শ। কারণ, তিনি ব্যতীত সকলের নিকটেই তাঁর আনীত দীনের কিছু অংশ অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কিন্তু সেটা তাকে আহলুল ইলম এর গণ্ডী থেকে বের করে দেয়নি। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে হক নির্ণয়ে ও তার অনুসরণে সাধ্য বহির্ভূত কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি।

أخطار التقليد وآثاره السيئة على المسلمين"

তাকলীদের সমূহ ঝুঁকি ও মুসলিমদের উপরে এর খারাপ প্রভাবসমূহঃ

সম্মানিত ভ্রাতাগণ, তাকলীদের ঝুঁকি ও এর খারাপ প্রভাবসমূহ এতো বেশি ভয়ংকর, যা আমাদের জন্য এই ছোট পরিসরে বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে অনেকগুলো বিশেষ গ্রন্থ আছে, যেগুলো এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। যার অধিক বিবরণের প্রয়োজন আছে, সে যেনো উক্ত গ্রন্থগুলোর দ্বারস্থ হয়।

গ্রন্থগুলোর মূল লক্ষ্য হল এই বিষয়টি বর্ণনা করা যে, তাকলীদই হল একমাত্র কারণ অথবা সবচেয়ে বড় কারণ, যা মুসলিমদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ করেছে এবং ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে কিতাব ও সুন্নাহর পক্ষপাতিত্ব বরণ করার পথে বাঁধা দিয়েছে। কারণ, মুকাল্লিদদের উপদলগুলো তাকলীদকে একটি ওয়াজিব বিষয়ে পরিণত করেছে — যেমনটি আমি শুনেছি — এবং অনুকরণীয় দীন হিসেবে ধার্য করেছে।

চতুর্থ শতাব্দীর পর কারোর জন্য তাকলীদের সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। যদি সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তাকে বৈচিত্রময় উপাধি দিয়ে জর্জরিত করা হয়। তার বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ শুরু করা হয় এবং তার মাঝে নেই এমন দোষের অভিযোগ থেকেও সে নিরাপদ থাকেন না। যেই বিষয়টি এই সম্পর্কে রচিত উভয় দলের কিছু সংকলিত রিসালাহ অধ্যয়নকারী ব্যক্তি মাত্রই খুব ভালো করে জানে।

আর যেহেতু আজকের দিনে অনেক মানুষের তুলনামূলক ফিকহ সম্পর্কে কোনো গবেষণা নেই, তাই এই সম্পর্কিত গবেষণা তার দক্ষ গবেষকের জন্য কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরে থাকা মুকাল্লিদগণের পরিধি উন্মোচিত করে দেয়। বরং তাদের মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করতে যেয়ে নিজেদের ইমামগণের তাকলীদ থেকে দূরে থাকা মুকাল্লিদগণের সীমা উন্মোচিত করে দেয়। তাদের মাঝে এমন অনেক ডক্টর আছেন, যারা এই বিষয়বস্তুর দারস প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যখন বিষয়টি এমনি, তাহলে এখন মানুষের নিজ সাধ্যানুসারে ঐ হাদীসগুলো স্মরণ করা উচিত, যেগুলো প্রথম দুই পরিচ্ছেদে আমি উল্লেখ করেছি। যেগুলো পরিমাণে অনেক স্বল্প, যেখানে এই বিষয়ক হাদীসগুলোর সংখ্যা হাজারের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে।

হাদীসগুলো স্মরণ করলেই দেখতে পাবেন যে, মুকাল্লিদদের উপদলগুলো সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা তাকলীদকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং দোষমুক্ত নয় এমন ব্যক্তির পক্ষপাতিত্ব করেছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – ইলামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে ৭৩টি স্পষ্ট সহীহ সুন্নাহ সমর্থিত আমলের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, যেগুলো মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলোতে তিনি বিস্তারির আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি ইলমী দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে অত্যন্ত শান্তভাবে তাদের মতের খণ্ডন করেছেন। শুরুতে তিনি আকীদা সংক্রান্ত সুন্নাহর দৃষ্টান্তগুলো উপস্থিত করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার স্বীয় সৃষ্টিকুলের উর্ধ্বে গমন করা। নিজ আরশে আরোহণ করা। বিষয়টির সমর্থনে আমি বলব:

জনৈক আল্লামা – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – কর্তৃক রচিত ইক্বাযুল হিমাম গ্রন্থে (৯৯ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন:

আল্লামা ইবনু দাকীক ঈদ – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – একটি মস্তবড় খণ্ডে এমন অনেক মাসআলা একত্রিত করেছেন, যেই মাসআলাসমূহে চার ইমামের প্রত্যেক মাযহাবই সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেছে একাকী অথবা একত্রে। গ্রন্থটির শুরুতে তিনি বলেছেন:

"أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم"

“এই মাসআলাগুলো মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে সম্বন্ধ করা হারাম। আর মুকাল্লিদ ফকীহগণের উপরে ওয়াজিব হল উক্ত মাসআলাগুলো সম্পর্কে জেনে রাখা। যাতে তারা সেগুলোকে তাদের দিকে সম্বন্ধ না করে। তাহলে এটা তাদের ব্যাপারে মিথ্যা রটানো হবে”।

واجب الشباب المسلم المثقف اليوم

আজকের দিনের সুদক্ষ মুসলিম যুবকের ওয়াজিব দায়িত্ব:

পরিশেষে সম্মানিত ভ্রাতাগণ: আমি এই আলোচনার দ্বারা তোমাদের সকলকে মুজতাহিদ ইমাম হওয়া বা মুহাককিক ফকীহ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি না। যদিও বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করে যেভাবে তোমাদেরকে আনন্দিত করে। তবে বিষয়টি ব্যক্তি বিশেষে পারদর্শিতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার আবশ্যকতা এবং বিশেষজ্ঞদের একে অপরকে (পার্থিব প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে) সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কারণে স্বভাবতই অসম্ভব।

আমি এই আলোচনা থেকে দুইটি বিষয় বলতে চেয়েছি:

প্রথম: আজকের দিনে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবকের নিকট অস্পষ্ট থেকে গেছে — অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম — এমন গভীর বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক হও। আর তা হল যেই সময়টিতে অনেক ইসলামী লেখকগণের নিরলস চেষ্টার বরকতে তারা সেই বিষয়টি জানতে পেরেছেন। যেমন, সায়্যিদ কুতুব — রহিমাহুল্লাহু তা'আলা — ও আল্লামা মওদূদী —রহিমাহুল্লাহু তা'আলা — ও অন্যান্য লেখকগণ। **বিষয়টি হল বিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে।** সেই অধিকারে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো মানব অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অংশীদার হতে পারে না। যেটাকে তারা — **الحاكمية لله تعالى** — শাসনক্ষমতার পূর্ণ কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'আলার একক অধিকার। এই বিষয়টি এই আলোচনার শুরুতে বর্ণিত কিতাব ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে।

আমি বলব: একই সময়ে উক্ত যুবকদের অনেকে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে জাগ্রত হতে পারেনি যে, শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এই আদর্শের ভিত্তির সাথে "সাংঘর্ষিক অংশীদারিত্ব" এর ক্ষেত্রে চাই তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো অনুকরণীয় মুসলিম ব্যক্তি হোক, যে বিধানের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়। চাই তা আল্লাহর সঙ্গে কোনো দায়িত্বশীল কাফেরকে বিধান প্রণেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হোক। চাই তা সে কোনো জাহেল ব্যক্তি হোক আর চাই কোনো আলেম হোক। এগুলোর প্রত্যেকটিই উল্লিখিত আদর্শের ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। যেই আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে যুবকগণ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। এই বিষয়টির ব্যাপারে তোমরা সজাগ

হও এটাই আমি চাই। আমি তোমাদেরকে উক্ত বিষয়ের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

"কারণ, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে" (আয যারীয়াত ৫১: ৫৫) ।

আমি অনেক খতীবকে পূর্ণ জোশ ও প্রশংসনীয় ইসলামী আত্মমর্যাদার সাথে শাসনক্ষমতায় আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খুতবা দিতে শুনেছি। তারা এই ক্ষেত্রে কুফরী শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। এটা খুব ভালো বিষয়। যদিও আমরা বর্তমানে সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারব না। পক্ষান্তরে আমাদের অনেকের অন্তরে এমন বিশ্বাস স্থাপিত, যা উক্ত আদর্শের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

যা পরিবর্তন করা সহজ। সেই বিষয়ে আমরা মুসলিমদেরকে সতর্ক করছি না। তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি না। বিষয়টি হল তাকলীদকে দীন বানিয়ে নেয়া এবং তাকলীদকে অবলম্বন করে কিতাব ও সুন্নাহর দলীল প্রত্যাখ্যান করা। এখন যদি আমি উক্ত খতীবকে কোনো আয়াত অথবা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক তার কোনো একটি মতের কথা বলি, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ মাযহাবের দ্বারা দলীল পেশ করার প্রতি ধাবিত হবে। অথচ সে এই বিষয়ে সজাগ হবে না। অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, সে তার এহেন কর্মের দ্বারা তারই আহবানকৃত সেই মহান আদর্শের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

"যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে আহবান করা হয় তাদের মাঝে মামলার নিষ্পত্তির জন্য, তখন তারা বলে: আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম" (আন আন নূর ২৪: ৫১) ।

সুতরাং তার জন্য একমাত্র পথ হল, সে শ্রবণকৃত উপদেশ আর দলীলের নিকট নিজেকে তৎক্ষণাৎ সমর্পণ করবে। যেহেতু সেটাই একমাত্র ইলম। তাকলীদের আশ্রয় নিবে না। কারণ, তা অজ্ঞতা।

দ্বিতীয়ঃ তোমরা তোমাদের অন্তরে অন্তত (কিতাব ও সুন্নাহর) এতটুকু মান স্থাপন করো, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক, সম্ভব ও সহজ হয়। যদিও পরিমাণে তা কম হয়। যেই মানটি ইজতিহাদ ও তাহকীকের স্তরের চেয়ে কম, যা (ইজতিহাদ ও তাহকীকের স্তরে) একমাত্র বিশেষ ব্যক্তিগণ ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

সহজ মানটি হল কেবল রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর অনুসরণ ও শুধুমাত্র তাঁরই অনুকরণ করা। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ সামর্থ অনুযায়ী তা করতে পারবে। তাহলে তোমরা তোমাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই মান্য যেভাবে করছ, একইভাবে তোমাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – কেই মান্য করবে।

সুতরাং তোমাদের মাবূদ একজন, তোমাদের আদর্শ ব্যক্তিও একজন। এর দ্বারা তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" সাক্ষ্যের দাবিও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

সুতরাং হে ভ্রাতাগণ, তোমরা তোমাদের অন্তরে এটা স্থাপন করে নাও যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর নিকট থেকে প্রমাণিত প্রতিটি হাদীসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। চাই তা আকীদা সম্পর্কে হোক অথবা আহকাম (বিধি-বিধান) সম্পর্কে হোক। চাই বিষয়টি তোমার মাযহাবের ইমামের কথা হোক, যেই মাযহাবের পরিবেশে তুমি বড় হয়েছ অথবা অন্যকোনো মুসলিম ইমামের কথা হোক।

আর ঐ সকল নীতির আলোকে কোনো নীতি প্রণয়ন করো না, যেগুলো ঐ সকল মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত-রায় ও তাদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে অথচ তারা মুজতাহিদ নন। তাহলে এটা তোমাকে প্রকৃত অনুসরণ (ইত্তিবা) থেকে বাঁধা দিবে। আর কোনো মানুষের অন্ধ তাকলীদ করে তার মতকে আল্লাহর রসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর মতের উপরে অগ্রাধিকার দিও না, যখন তার হাদীস তোমাদের নিকট পৌঁছে যায়, চাই সে যত বড় ও মহান ইমাম হোক না কেন।

জেনে রাখো, তোমরা শুধুমাত্র এর মাধ্যমে – অন্য কোনো কর্মের মাধ্যমে নয় – কর্ম ও জ্ঞান উভয় দিক থেকে ঐ আদর্শের বাস্তবায়ন করছ, যা এই কথার স্বীকৃতি দেয়ঃ

"لا إله إلا الله منهج الحياة"

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জীবনের একমাত্র আদর্শ" এবং

"الحاكمية لله وحده تبارك وتعالى"

"শাসনক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ – তাবারকা ওয়া তা'আলা – এর একক অধিকার"।

এটা ব্যতীত আমাদের জন্য "অদ্বিতীয় কুরআনের আদর্শ মণ্ডিত প্রজন্ম" সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যে প্রজন্ম এককভাবেই "মুসলিম সমাজ ও সেই সমাজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য" গঠন করতে সক্ষম হবে।

তার পরের ধাপেই কাংক্ষিত মুসলিম রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐ বাস্তবিক প্রজ্ঞার সত্যায়নে, যা জনৈক মহান মুসলিম দাঈ – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – বলেছিলেন:

"أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم"

"ইসলামী রাষ্ট্র আগে তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করো, তাহলে তোমাদের পৃথিবীতে তোমাদের কল্যাণে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে"। হয়ত সেই সময়টি অত্যাসন্ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দাও, যখন তিনি (আল্লাহর রসূল) তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি আহবান করেন, যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন সঞ্চারক। আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। আর তাঁর সামনেই তোমাদেরকে উঠানো হবে"। সূরা আল আনফাল ৮:২৪

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লহি ওয়া বারকাতুহু।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. আকীদাতুত তাওহীদ
-ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৫. আল ইরশাদ- সহীহ্ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৬. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৭. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৮. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
-ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৯. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১১. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২. নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৩. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ্ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৫. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৬. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৭. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৮. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

২০. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২১. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২২. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৩. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৪. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৬. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৮. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

২৯. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩০. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩১. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল

-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক

-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ্ হতে মুক্তির উপায়
-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ

- ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরঊর
[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]